সুকুমারী।

গার্হস্থ্য উপন্যাস।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রণীত।

কলিকাতা

১৬নং শিবনারায়ণ দাসের গলি

সোমপ্রকাশ সমিতি যন্ত্রে

বি, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ॥• আনা।

সুকুমারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে বঙ্গদেশে কৌলীন্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। তখন এক হস্তে ছিন্ন পাদুকা, অন্যহস্তে গোলপাতার ছাতি, কোমরে চাদর, গলদেশে শুভ্রবর্ণ পৈতার গোছা, বগলে নামাবলীর খাতা, কুলীনবংশাবতংশগণকে রথী, মহারথীর ন্যায় দিগ্বিজয়িবেশে সর্ব্বদাই রাজপথে দেখিতে পাওয়া যাইত। ইঁহাদের খাতায় শ্বশুরগণের নাম ও ধাম লেখা থাকিত। কুলীনতনয়গণ কৌলীন্যমর্য্যাদায় গদ্‌গদচিত্ত; কাজেই লেখা পড়ার কেহ বড় একটা ধার ধারিতেন না। খাতায় শ্বশুরগণের নাম ও ঠিকানা অপরকে দিয়া প্রায়ই লিখাইতে হইত। রামনগর গ্রামের শশিশেখর শর্ম্মা এক দিন নিজ খাতায় একটী ছেলেকে দিয়া আপন নবার্জ্জিত শ্বশুরের নাম ও ঠিকানা লিখাইয়া লইতেছিলেন। ছেলেটী সবে কলাপাতে নাম লিখিতে ছিল। কুলীন মহাশয় যত্ন করিয়া ছেলেটিকে লইয়া
। আপন খাতায় কৃষ্ণলাল রায় নাম লিখিতে বলিলেন।
টী কৃষ্ণলাল রায়ের নাম কঞ্চির কলমে বড় বড় করিয়া
লিখিল। পরে ঠিকানা লিখিবার সময় রাইপুর না লিখিয়া

রায়পুর লিখিয়া চলিয়া গেল। ছেলেটী যে কি লিখিল, তাহা শশিশেখর নিরক্ষর থাকা প্রযুক্ত জানিতে পারিলেন না। কোমল-মতি নিরীহ বালকের উক্ত সামান্য ভ্রমে যে কি সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল, তাহা পরে বিবৃত হইবে। কিন্তু গ্রামের একজন ভদ্রলোক তাহাকে দিয়া নাম লিখাইয়া লইয়াছে, এই বিষয়টী বালকের পিতামাতার বড়ই আনন্দের কারণ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে রায়পুর গ্রামের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই গ্রামে সদানন্দ দত্ত নামে একজন সুবর্ণবণিকের বাস ছিল। সদানন্দের বয়স ৪৫ বৎসর, গঠন সুদৃঢ়, রং কাল, চক্ষুঃ দুটী ক্ষুদ্র। সদানন্দ একজন বড় মানুষ লোক ; অনেক ধনসম্পত্তি আছে ; জমীদারী আছে। তেজারতীতে সদানন্দের অনেক টাকা খাটে। অনেক সুদে সদানন্দ টাকা ধার দেয়। একবার সদানন্দের নিকট টাকা ধার করিলে ঋণ পরিশোধ হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা থাকিত না। অধমর্ণের পৌত্র প্রপৌত্রকে পর্য্যন্ত কখন কখন ঋণের জের টানিয়া আসিতে হইত। সদানন্দ এদিকে বড় মিষ্টভাষী, ব্রাহ্মণ সজ্জন দেখিলে প্রণাম করিতে ভুলিত না। সদানন্দ নিজের কায়িক পরিশ্রমে যাহা সম্পন্ন হইতে পারিত, তাহাতে লোক রাখিত না ; নিজেই সম্পন্ন করিত। অধিকন্তু কৃপণের যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকা সম্ভব, সদানন্দে তাহা সমস্তই ছিল।

বর্ষাকাল, রাত্রি ১০টা বাজিয়াছে, উপশ্রান্তে বৃষ্টি পড়িতেছে ;

গ্রামের রাস্তায় এক হাঁটু কাদা; সদানন্দ তেজারতীর খাতা খুলিয়া সেই দিনের মা লক্ষ্মীর কৃপার দৌড় বুঝিতেছিল। সেই দিন কত টাকা সুদ, কত টাকা সুদের সুদ, তস্য সুদ, আদায় হইয়াছে, তাহাই সদানন্দ স্থির করিতেছিল। এমন সময় কৃষ্ণচন্দ্র রায় নামে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বয়স ৬০ বৎসর হইবে, পায়ে এক পা কাদা সমেত সদানন্দের ঘরে প্রবেশ করিলেন। এরূপ অসময়ে সদানন্দ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আগমনে কিছু বিস্মিত হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বসিবার জন্য একখানি চৌকী দিল, এবং এত রাত্রে ব্রাহ্মণের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ বসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। সদানন্দ ব্রাহ্মণকে ক্রন্দনের কারণ যতই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ ততই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সদানন্দ বিষম ফাঁপরে পড়িল। তখন পর্য্যন্ত সদানন্দের খাতা দেখা শেষ হয় নাই। অথচ একজন ব্রাহ্মণ সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতেছে। খাতা দেখায় মনঃসংযোগ হওয়া কঠিন। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ কিছু শান্ত হইলে সদানন্দ পুনরায় ব্রাহ্মণকে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

ব্রাহ্মণ আপন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষুঃ মুছিয়া সদানন্দের দুইটী হাত জড়াইয়া ধরিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সদানন্দ কহিল, "রায় মহাশয়, অমন করিতেছেন কেন? কি হয়েছে বলুন। আমার হাত ধরা আপনার উচিত নয়।" এই বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া ব্রাহ্মণের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায় বলিলেন, "সদানন্দ, আজ সাত আট বৎসর হইল, আমার কন্যা সুকুমারীর বিবাহ উপলক্ষ্যে তোমার নিকট হইতে ২০০৲ টাকা ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া কর্জ্জ করিয়াছি। কিন্তু তাহা

শোধ দেওয়া দূরে থাকুক, সেই টাকার সুদের দরুণও অনেক টাকা তোমার পাওনা রহিয়াছে। তথাপি আজ বড়ই বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট আবার কিছু টাকা ধার করিতে আসিয়াছি। আজ সাত বৎসর পরে জামাই বাটীতে আসিয়াছেন, তিনি এক পা কাদা সহিত চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন, পা ধুইবার টাকা না পাইলে কিছুতেই পা ধুইবেন না। অত বড় কুলীনের ছেলে ২৫৲ টাকার কম পা ধুইবেন না, সঙ্কল্প করিয়াছেন। টাকা না পাইলে তিনি এখনই ফিরিয়া যাইবেন। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কিছু সময় লইয়া আসিয়াছি। সদানন্দ, আরো ২৫৲ টাকা এখনি আমাকে দিতে হবে। যা সুদ চাহিবে তাহাই আমি দিব। আমি এখন খাতায় সই করিয়া দিতেছি, পরে খত করিয়া লইও।” সদানন্দ ঘোর বিষয়ী; ব্রাহ্মণের ন্যায় অনেক লোক সদানন্দের বাটীতে চক্ষের জল ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া সদানন্দ সুদের হার চড়াইতে লাগিল; এবং টাকায় অধিক সুদে ব্রাহ্মণকে সম্মত করিয়া ২৫৲ টাকা ধার দিলে। ব্রাহ্মণ ২৫৲ টাকা পাইয়া ত্বরিতগমনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ যখন প্রকৃতি দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাত্রি ১১টা। জামাই বাবু তখন পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া আছেন। টাকা না পাইলে সেই রাত্রেই ফিরিয়া যাইবেন, মনে মনে এই ভাবিতে-

ছিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গৃহিণীর হস্তে ২৫৲ টাকা দিলেন; এবং জামাইকে বাড়ীর ভিতর আনিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। গৃহিণীও জামাতাকে বাড়ীর ভিতর আনয়নের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় জামাইকে আনিতে বাহিরে গেলেন। জামাই-বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের গৃহে প্রত্যাগমনে বিলম্ব হওয়ায়, শ্বশুর মহাশয় নিশ্চয়ই টাকার যোগাড় করিয়া তবে বাটী ফিরিয়াছেন, এই ভাবিয়া মনে মনে খুসী হইতেছিলেন; কিন্তু ৫০৲ টাকা না চাহিয়া ২৫৲ টাকা চাওয়া বোকামির কার্য্য হইয়াছে মনে করিয়া, জামাই বাবুর মন এক একবার অপ্রসন্ন হইতেছিল। রায় মহাশয় জামাই বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবাজী বাড়ীর ভিতর এস।" জামাই বাবু টাকা না পাইলে বাটীর ভিতর যাইতে পারেন না, এই ভাব ব্যক্ত করায়, রায় মহাশয়, "টাকা এখনি দিতেছি, গৃহিণীর নিকট রহিয়াছে;" এই বলিয়া জামাই বাবুর হাত ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন এবং স্বয়ং জলের গাড়ু ও গামছা আনিয়া দিয়া জামাতার পদপ্রক্ষালনের আয়োজন করিয়া দিলেন। এই সময় রায় মহাশয় একবার খাতাখানি দেখিতে চাহিলেন। জামাই বাবু কিছু রাগ করিয়া খাতাখানি রায় মহাশয়ের হস্তে দিলেন। রায় মহাশয় খাতা খুলিয়া প্রদীপের আলোয় আপন নাম ও ধাম পাতে পাতে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জামাই বাবুর অনেক গুলি বিবাহ, সুতরাং অনেক নাম রায় মহাশয়কে পড়িতে হইতেছিল, অনেক ঠিকানা উণ্টাইতে হইতেছিল; এবং জামাই বাবু যে মস্ত কুলীন, এই ভাবিয়া রায় মহাশয় আপনাকে ধন্য মনে করিতেছিলেন। গৃহিণী কিছু নির্ব্বোধ ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি

কন্যাকে জামাতার সহিত সম্মিলিত করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন; আজ ৭। ৮ বৎসর জামাতা আসেন নাই; বিবাহ করিয়া আর শ্বশুর বাটীর মুখ দেখেন নাই। গৃহিণীর আর বিলম্ব সহে না, কৃষ্ণচন্দ্র রায় খাতাখানি হইতে কৃষ্ণলাল রায়, রায়পুর পড়িলেন এবং পড়িয়া বলিলেন যে, "আমার নাম কৃষ্ণলাল নয়, কৃষ্ণচন্দ্র।" গৃহিণী অধিক চতুরা; তিনি বলিলেন, "জামাইকে অত পীড়াপীড়ি করা ভাল নয়; সব মিলেছে, কৃষ্ণচন্দ্র না লিখিয়া কৃষ্ণলাল লিখেছে, এমন ভুল হয়, দাও তুমি টাকা দেও।" গৃহিণীর ব্যস্তভাব দর্শনে রায় মহাশয় দ্বিরুক্তি না করিয়া জামাই বাবুর হস্তে ২৫৲ টাকা প্রদান করিলেন। ২৫৲ টাকা দিবার সময় ব্রাহ্মণের হৃদয়গ্রন্থি যেন ছিন্ন হইয়া গেল। দুঃখী ব্রাহ্মণের পক্ষে আপন হৃদয়ের কিছু রক্ত দান করা বোধ হয় এতদপেক্ষা সহজতর ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রায় মহাশয়ের বাড়ীটী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। বাহিরে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়া বাটীর ভিতর খান কয়েক খড়ুয়া ঘর ছিল উঠানটীতে একটী ঘাস পর্য্যন্ত থাকিতে পাইত না। উঠানের উপর একটী তুলসীগাছ। তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলি বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ রায় মহাশয়ের কন্যা প্রতিবাসীর বাটী হইতে আনিয়া যত্নপূর্ব্বক পুতিয়াছিল। রায় মহাশয়ের কন্যার নাম সুকুমারী। সুকুমারী অপরিষ্কার দেখিতে পারে না। আপন হস্তে বাটীটী পরিষ্কার রাখে। ফুলগাছ গুলিতে নিজ হস্তে জল

দেয়। ফুল তুলিয়া মালা গাঁথে। মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যা সকালে তুলসী-চরণে অর্পণ করে, আর কি বর প্রার্থনা করে, তাহা কেহ জানিতে পারে না। সুকুমারী অদ্য স্বামীর সহিত দেখা শুনা হইবে ভাবিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেছিল বটে, কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে তাহার মনে একটী বিষম সন্দেহের ভাব দেখা দিতে ছিল। সুকুমারী রায় মহাশয়কে খাতা খুলিতে দেখিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র না পড়িয়া পিতা কৃষ্ণলাল পড়িয়াছিলেন; এই সব কারণে তাহার মনে ভয় হয় যে, উপস্থিত জামাই বাবু পাছে তাহার স্বামী না হন। সুকুমারী স্বামীকে সেই শুভদৃষ্টির সময় যা দেখিয়াছিল। তখন তাহার বয়স দশ বৎসর ছিল। এক্ষণে সুকুমারীর বয়ঃক্রম ১৭। ১৮ বৎসর। সুকুমারী ৭।৮ বৎসর স্বামীর মুখ দেখে নাই। অতএব সেই বিবাহরাত্রের শুভদৃষ্টিকালীন চকিতদৃষ্টিক্ষেপের পর স্বামীর মুখ মনে রাখা সহজ নহে। কাজেই সুকুমারীর মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছিল। কর্ত্তা গৃহিণীও যে জামাতাকে চিনিতে পারেন নাই, খাতা দেখাতেই সুকুমারী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সুকুমারীর মাতা সুকুমারীকে জামাতৃগৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং সেই দিন প্রভাতে প্রথম কাহার মুখ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে স্বামি-সন্নিধানে গমন করিলেন। এদিকে সুকুমারী গৃহে প্রবেশ করিলে জামাই বাবু শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া বসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে জামাই বাবুর মস্তক ঘুরিয়া গেল। জামাই বাবু অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কই, এমন সুন্দরী স্ত্রী তাঁহার ভাগ্যেত একটীও ঘটে নাই। তিনি একদৃষ্টে সুকুমারীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সুকুমারী শয্যার

অনতিদূরে দণ্ডায়মানা ছিল। সুকুমারী পরমাসুন্দরী; তাহাতে যৌবনে সুকুমারীর রূপ যেন শত গুণ অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জামাই বাবু সুকুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে শয্যায় আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সুকুমারী জামাই বাবুর হস্ত হইতে নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, "তুমি যে আমার স্বামী, তাহার প্রমাণ কি?" সুকুমারী বেশ লেখা পড়া জানিত। সুকুমারীর কথা শুনিয়া জামাই বাবু বলিলেন, "আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, এই তাহার প্রমাণ।" জামাই বাবু কুলীনের ছেলে, নিরক্ষর; জামাই বাবুর পিতা পুত্রকে লেড়া পড়া শিখিতে দেওয়া অবমাননার কথা অবশ্যই মনে করিয়াছিলেন। কুলীনের ছেলেকে যদি লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া নিজের গুজরান করিতে হয়, তবে চাষা ভূষোর ছেলেদের সহিত তাহার কি পার্থক্য রহিল? এই ধারণায় প্রায় কুলীন পিতা পুত্রকে পাঠশালায় পর্য্যন্ত যাইতে দিতেন না। এক্ষণে জামাই বাবু সুশিক্ষিতা রমণীর হস্তে পড়িয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন; কথার জবাব দিতে বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। বলিলেন, "তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী, এর চেয়ে আর অধিক প্রমাণ কি হইতে পারে? তুমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? তুমি জান, ইহাতে আমার অপমান হইতেছে, আমি কুলীনের ছেলে. তোমার সঙ্গে এত কথা কহিতেছি, এই তোমার ভাগ্য; তুমি আবার প্রমাণের কথা কহিতেছ!" সুকুমারী মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, রাগ করিও না, আমি বুঝিতেছি, আজ আমার বড়ই সুখের দিন, কিন্তু আমার কথার জবাব না দিলে আমি তোমার কাছে যাইব না। বল দেখি, বিবাহরাত্রে দিদি মা তোমার সঙ্গে

ঠাট্টা করিয়া তোমার নিকট হইতে কি লইয়াছিলেন এবং তোমাকে কি দিয়াছিলেন। ইহার উত্তর তুমি দিতে না পারিলে তুমি আমার স্বামী নও, আমি জানিব।" জামাই বাবু বলিলেন, "তাহা আজ অনেক দিনের কথা; আমি বলিতে পারিব না।"

সুকুমারী। মনে করিয়া না বলিতে পার ত আমি এখনি এখান হইতে চলিয়া যাইব। আজ ৭।৮ বৎসর হইল, আমার বিবাহ হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক সময় হইলেও সে কথা মনে থাকিবার কথা; তুমি না বলিতে পার ত আমি চলিলাম।" এই বলিয়া সুকুমারী গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, জামাই বাবু সুকুমারীর হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, "কোথায় যাও? আমি তোমার স্বামী, আমার কথা না শুনিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?" সুকুমারী সজোরে আপন হাত ছাড়াইয়া একটী বাক্স হইতে একটী কৌটা বাহির করিল এবং কৌটার ভিতর হইতে একটী আংটী বাহির করিয়া বলিল, "বল দেখি, এ আংটী কাহার? তবে জানিব, তুমি আমার স্বামী।"

সুকুমারীর দিদিমা তাঁহার নাতি জামাতার সহিত এই আংটী বদল করিয়াছিলেন; আর বলিয়াছিলেন, নাতি জামাইয়ের সহিত আংটী বদল ও মালা বদল, একই কথা। নাতি জামাইয়ের অঙ্গুলিতে তাঁহার আংটী এমন দৃঢ়রূপে কসিয়া গিয়াছিল যে, আংটী খুলিতে নাতি জামাই বাবুর অঙ্গুলির একপুরু ছাল উঠিয়া গিয়াছিল। সে কথা মনে থাকিতে পারে, এই ভাবিয়া সুকুমারী উক্ত প্রশ্ন করিতেছিল। সুকুমারী স্বামিপরীক্ষায় জামাই বাবুকে উত্তীর্ণ হইতে অপারক দেখিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল। জামাই বাবু অন্য স্ত্রী এরূপ ব্যবহার করিলে হয়ত তখনি শ্বশুর

বাটী হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়া আসিতেন; কিন্তু তিনি সুকুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং জোর করিয়া সুকুমারীর হস্ত চাপিয়া ধরিয়া স্বামিত্ব সাব্যস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুকুমারী বিশেষ ভীতা হইয়া নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিল এবং আপন সতীত্ব রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া জামাই বাবুর পদ ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল; এবং বলিল, "আপনার ভুল হইয়াছে, আপনি আমার স্বামী নহেন, আপনার শ্বশুর বাটী ভুলিয়া গিয়া আজ এই খানে আসিয়াছেন; আপনি আমাকে ছাড়িয়া দেন, এই কথা প্রচার হইবার পূর্ব্বেই আপনি চলিয়া যান।" জামাই বাবু সুকুমারীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সক্রোধে সুকুমারীকে আপন শয্যায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সুকুমারী অনন্যগতি হইয়া সজোরে জামাই বাবুর হস্ত কামড়াইয়া ধরিল। জামাই বাবু বিকট চীৎকারে সুকুমারীর হাত ছাড়িয়া দিল। সুকুমারী দৌড়িয়া গিয়া আপনার রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল; এবং দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া রাত্রি যাপন করিল। সেই রাত্রে সুকুমারীর মাতা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, জামাই বাবু সুকুমারীকে আপন বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য দাসদাসী সহিত শিবিকা লইয়া আসিয়াছেন। জামাই বাবু সুকুমারীকে স্বহস্তে সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরাইয়া দিতেছেন। সুকুমারীর আনন্দের সীমা নাই। সুকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিবে, এমন সময় সুকুমারীর মাতা সুকুমারীকে বিদায় দিতে পারিবেন না বলিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কর্তা গৃহিণীর ক্রন্দনে জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, গৃহিণী নিদ্রার ঘোরে কাঁদিতেছেন। অনেক ঠেলাঠেলির পর গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৃহিণী বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া

চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে দেখিলেন যে, তাহার সম্মুখে কর্ত্তা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; তখন তিনি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কর্ত্তাকে বলিলেন। কর্ত্তা প্রভাতের স্বপ্ন নিশ্চয়ই সত্য হইবে, এই বলিয়া গৃহিণীর সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং প্রভাত হইয়াছে, কাক পক্ষী ডাকিতেছে দেখিয়া দুর্গানাম স্মরণপূর্ব্বক ঘরের বাহিরে আসিলেন। আসিয়াই দেখেন, জামাই বাবু আপন তল্পী লইয়া রাগভরে বাটী হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। কৃষ্ণ চন্দ্র রায় শশব্যস্তে জামাই বাবুর হাত ধরিয়া রাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারথী কুলীন মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "আপনার বাটীতে কুলীনের এতদূর অপমান, কুলীনের স্ত্রী স্বামীকে এতদূর তাচ্ছল্য করে। তাহার পরম ভাগ্য যে, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি তাহাকে কত যত্ন করিলাম, কত আদর করিলাম। সে কি না আমার হাতে কামড়াইয়া দিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল!" এই বলিয়া জামাই বাবু আপন হস্তের দাগ দেখাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় দেখিলেন, জামাই বাবুর হস্ত হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। সুকুমারী অতিশয় সুশীলা, সে এমন কাজ কেন করিল, রায় মহাশয় বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে গৃহিণী আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার প্রভাতের স্বপ্ন ষোল আনা ঠিক সত্য হইয়াছে দেখিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; এবং আপনার জন্মে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ভিটায় কুলীনের ছেলের অপমান হইল, না জানি কি অমঙ্গল হইবে, এই ভাবনায় গৃহিণী ও কর্ত্তা উভয়ের মন বড়ই চঞ্চল হইল।

এমন সময় সদর দ্বারে কে একজন আঘাত করিল। কর্ত্তা

"কেও" বলিয়া উত্তর দিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দিয়া দেখিলেন, একটী লোক দ্বারে দণ্ডায়মান; তখনও বিশেষ ফরসা হয় নাই; কর্ত্তা মহাশয় লোকটীকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আগমন ?" আগন্তুক কর্ত্তা মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আজ্ঞে আমার নাম হৃষীকেশ শর্ম্মা, বাটী শ্যামনগর, মহাশয় আমার শ্বশুর, আপনার কন্যা সুকুমারীকে আমি অদ্য সাত বৎসর নয় মাস বিবাহ করিয়াছি; কার্য্যগতিকে এতদিন মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম।" কর্ত্তা মহাশয় যদিও সুকুমারীর স্বামীকে সাত আট বৎসর দেখেন নাই, আগন্তুকের পরিচয় পাইয়া আগন্তুকই যে সুকুমারীর স্বামী, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি দৌড়িয়া গৃহিণীর নিকট যাইয়া গৃহিণীকে সকল বিষয় বলিলেন এবং "গৃহিণী, জাত গেল, মান গেল, আমার সর্ব্বনাশ হল;" বলিয়া আপ্সাইতে লাগিলেন। গৃহিণীর চক্ষু কপালে উঠিল। সুকুমারী কপাটের অন্তরাল হইতে হৃষীকেশকে দেখিয়া যেন আপন স্বামী বলিয়া চেন চেন করিতে লাগিল। এই অপরূপ মূর্ত্তিই যেন সে শুভদৃষ্টির সময় দেখিয়াছিল বলিয়া, মনে স্থির করিতেছিল। আগন্তুক জামাইটী দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, ছিপছিপে গঠন। হৃষীকেশ শর্ম্মা তখন উঠানে আসিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মানে ত্রুটি হইতেছে ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। তাঁহার পদে এক পদ কর্দ্দম, হস্তে গোলপাতার ছাতি, বগলে খাতা, মস্তকে লম্বা শিখা। পুরুষরত্ন সুকুমারীর সাত পুরুষ উদ্ধার করিবেন ভাবিয়া শ্বশুর বাটীতে শ্রীপদ অর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রায় এমন নির্ব্বোধ যে, তিনি আপনার হিত না বুঝিয়া এমন পুরুষ-রত্নকে তাচ্ছল্য

করিতেছেন। মঙ্গল ঘট আপন চরণ দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। হৃষীকেশ শর্ম্মা এরূপ তাচ্ছল্যে আর এক মুহূর্ত্তও সেই স্থানে অবস্থান করিবেন না, এই ভাবিতেছেন; এমন সময় গত রাত্রের জামাই বাবু তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। শশিশেখর শর্ম্মার তখনও রাগ পড়ে নাই। হৃষীকেশ শর্ম্মা শশিশেখরকে এত প্রত্যুষে আপন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতে দেখিয়া এবং তৎসঙ্গে তাঁহার নিজের প্রতি শ্বশুর মহাশয়ের তৎকালোচিত অভ্যর্থনার ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারিলেন, শ্বশুর মহাশয় জামাতা চিনিতে না পারিয়া হয়ত এই লোকটীকে জামাতা বলিয়া ঘরে লইয়াছেন। তখন তাঁহার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিয়া গেল। শশিশেখরের মনও পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনায় বড়ই খারাপ হইয়া রহিয়াছিল। হৃষীকেশ শশিশেখরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি এই বাটীতে বিবাহ হইয়াছে" ?

শশী। হাঁ।

হৃষী। তোমার খাতা আছে ?

শশী। হাঁ আছে।

এই সময়ে কর্ত্তা ও গৃহিণী সমস্যাপূরণ দেখিবার জন্য ব্যগ্রভাবে উঠানে আসিলেন। কর্ত্তার মুখ শুকায়ে গিয়াছে, গৃহিণী শশীর যেন জিত হয়, নারায়ণের নিকট মানিতে লাগিলেন। শশী খাতা খুলিয়া কৃষ্ণলাল রায়, রায়পুর, দেখাইলেন। হৃষীকেশ আপন খাতা হইতে কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাং রায়পুর সন, তারিখ, স্ত্রীর নাম পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিলেন, উভয়েই রায় মহাশয়কে আপন শ্বশুর বলিয়া গোল করিতে লাগিলেন। হৃষীকেশ শর্ম্মা শশিশেখরকে জুয়াচোর বদমায়েস বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। শশিশেখরও

হৃষীকেশকে গালি দিতে ত্রুটি করিলেন না। ঘোর বাক্ বিতণ্ডা—এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র রায় নীরব, নিস্তব্ধ; সব গেল, সর্ব্বনাশ হল; এই ভাবিতে লাগিলেন। গৃহিণী কান্না জুড়িলেন। মহারথী কুলীনদ্বয় তর্ক ছাড়িয়া হাতাহাতি করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুকুমারী নারায়ণকে ডাকিতে লাগিল; এবং আপনার অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে লাগিল। কিন্তু সে যে আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে, এই ভাবিয়া মনে মনে কতক আশ্বস্তা হইল। ঘোর শোর গোল শুনিয়া গ্রামের লোক কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাটীতে জুটিতে লাগিল এবং ব্যাপার দেখিয়া কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ কর্ত্তাকে, কেহ বা গৃহিণীকে, নিন্দা করিতে লাগিল। এমন সময় সেই ভিড়ের মধ্য হইতে একটী বৃদ্ধ আসিয়া শশীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, আজ সাত বৎসর হইল, তুমি যে আমার কন্যা কিরণবালাকে বিবাহ করিয়াছ। আমার নাম কৃষ্ণলাল রায়, বাটী রাইপুর।" সকলে বুঝিল, শশীর খাতা যখন অপরের হস্তে লিখিত তখন শশীরই ভুল।

ভ্রমে লেখক রাইপুরের স্থলে রায়পুর লিখিয়াছে; এবং এই কথা লেখকের হিজিবিজি লেখা দেখিয়া সকলেই আরও বিশ্বাস করিল। শশী আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু সুকুমারীর রূপ তাঁহার হৃদয়ে বড়ই যাতনা দিতেছিল, এই জন্য ভুল বুঝিয়াও যেন বুঝিতেছিলেন না। কিন্তু যখন সকলেই শশীকে তিরস্কার করিতে লাগিল, তখন তিনি মনের দুঃখ মনে নিবারণ করিয়া আগন্তুক শ্বশুরের সঙ্গে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। আগন্তুক শ্বশুর মহাশয় আপন কুলীন জামাতার অপমান স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের, ভিটায় কুলীনের

অপমান হইল, তবে তাঁহার আর ভদ্রত্ব নাই; এই মত প্রকাশ করিতে করিতে জামাতার সহিত সেই বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শশিশেখর কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দত্ত টাকা কয়টী লইয়া যাইতে ভুলিলেন না। গৃহিণী কর্ত্তাকে টাকা কয়টী ফেরৎ লইবার জন্য বার বার ঈসারা করিলেন; কিন্তু কর্ত্তা তখন অপমানে মরিয়া গিয়াছেন; টাকা চাহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এদিকে গোলযোগ মিটিয়া গেলে হৃষীকেশ শর্ম্মা শ্বশুরকে দুই একটী সরল মিষ্ট মিষ্ট কথা দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া বাটী হইতে চলিয়া গেলেন; এবং সেই বাটীতে যে আর কখনও পদার্পণ করিবেন না, তাহা শপথপূর্ব্বক বলিয়া গেলেন। সুকুমারী যে কুলটা এবং সে যে তাহার পিতামাতার উপার্জ্জনের স্থল, তাহাও প্রকারান্তরে জানাইয়া শ্বশুরকে সুখী করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ধরিত্রি, তুমি দ্বিধা হও, তোমার মধ্যে প্রবেশ করি, এইরূপ বাক্য বিন্যাস দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সুকুমারী হইতে যে তাঁহার অদৃষ্টে এতদূর সুখ হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ইত্যাকার বাক্যে গৃহিণীকে সুখী করিতে লাগিলেন। সুকুমারীর জন্মেরও কত প্রশংসা করিলেন! ফলতঃ কর্ত্তার অপমানের আর সীমা রহিল না। পাড়ায় পাড়ায় গুজব, হাসি, ঠাট্টা, চলিতে লাগিল। পাড়ার বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোক সকলে মিলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে একঘরে করিয়া নিজ নিজ বিজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। তাঁহার হুঁকা বন্ধ হইল, পাড়ার গৃহিণীগণ, সুকুমারীর নরকেও স্থান হইবে না, এই স্থির করিয়া দুঃখে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন বিপদ্ আসে, তখন চারিদিক্ হইতেই আসিয়া লোককে চাপিয়া ধরে। কৃষ্ণচন্দ্র রায়, কন্যার জাতি গেল, নিজে একঘরে হইলাম, সমাজে আর মুখ দেখান উচিত হয় না, এই সমস্ত ভাবিয়া একেবারে মৃতকল্প হইলেন। তিনি একদিন অধিক রাত্রে প্রলাপ বকিতেছিলেন। গৃহিণী উঠিয়া দেখেন, কর্ত্তার বড় জ্বর হইয়াছে; ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, কর্ত্তা এলোমেলো কি বকিতেছেন, ডাকিলে উত্তর নাই। গৃহিণী তাড়াতাড়ি সুকুমারীকে ডাকিয়া দিয়া নিজে হলধর চূড়ামণি বৈদ্যকে ডাকিতে গেলেন। বৈদ্য আসিয়া রোগীর অবস্থা বড় খারাপ দেখিলেন ও সেই মত প্রকাশ করিলেন। গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন। সুকুমারী দেবতাকে এক মনে ডাকিতে লাগিল ও তাহার চক্ষুঃ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৈদ্য সকলকে আশ্বস্ত করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। তিন দিন কর্ত্তার জ্ঞান গোচর কিছুই রহিল না। চতুর্থ দিবসে যখন জ্ঞান হইল, কর্ত্তা দেখিলেন, শয্যা-পার্শ্বে সদানন্দ বসিয়া আছে। সদানন্দ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অন্তিম সময় শুনিয়া তাড়াতাড়ি নিজের টাকার কিনারা করিতে আসিয়াছিল। কর্ত্তার জ্ঞান হইয়াছে। দুই চারিটী সজ্ঞান কথা কহিতেছেন, দেখিয়া সদানন্দ টাকার কথা পাড়িল। কৃষ্ণচন্দ্র রায় সানুনয়ে কয়েক দিবস অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আরো

বলিলেন যে, "আমি ভাল হইয়া এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। আমার ভদ্রাসন বাটী বিক্রয় করিয়া তোমার টাকা পরিশোধ করিব।" সদানন্দ দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল এবং পর দিবস টাকা আদায়ের জন্য কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামে আদালতে নালিশ করিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায় রোগশয্যায় শয়িত। পরিবারের কষ্টের ইয়ত্তা নাই। সুকুমারী তুলসী-চরণে মালা গাঁথিয়া দেয় ও পিতার আরোগ্য কামনা করে। সুকুমারীর সেই কমনীয় মুখকান্তি হিমস্পৃষ্ট কমলের ন্যায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। "স্বামী আমাকে দ্বিচারিণী মনে করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পিতা অপমানে জীবন ত্যাগ করিতেছেন, এ জীবনে আর কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ," এই সমস্ত ভাবিয়া সুকুমারীর নয়ন প্রান্তে কালিমা দেখা দিয়াছে। ফলতঃ সুকুমারীর কষ্টের আর সীমা নাই। গৃহিণী, কর্ত্তার সেবায় দিন রাত্রি ব্যস্ত; আহার নাই, নিদ্রা নাই, আহারের সংস্থানেরও অসদ্ভাব। কোন দিন জোটে, কোন দিন অনাহারে যায়। ঘোর বিপদ্। এমন সময় আদালতের পিয়াদা আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দ্বারদেশে একখানি আদালতের সমন লটকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কর্ত্তা নালিশের কথা সমস্ত শুনিলেন। আদালতের পিয়াদার আগমনের কথা শুনিলেন। মাথা ঘুরিয়া গেল। সেই দিন জর বাড়িল। কর্ত্তা আবার অজ্ঞান হইলেন। বৈদ্য আসিয়া কর্ত্তাকে নালিশের কথা কেন শুনান হইল, এই বলিয়া সকলকে তিরস্কার করিলেন। সমনের কথা না শুনাইলেই হইত, বলিলেন। হলধর চূড়ামণি বিশেষ ভদ্রলোক, গরিবের মা বাপ। বিনামূল্যে কর্ত্তাকে ঔষধাদি দিতেছেন ও বার বার দেখিয়া যাইতেছেন। জ্বরের প্রকোপ

দেখিয়া বৈদ্য চূড়ামণির ভয় হইল। বলিলেন, "এইরূপ অজ্ঞানতা আর চব্বিশ ঘণ্টা থাকিলে রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা। যাহা হউক, ঔষধ দিলাম, চব্বিশ ঘণ্টার পূর্ব্বে জ্ঞান হইতে পারে।" এই কথা বলিয়া ও বিশেষ সতর্কতার সহিত রোগীর শুশ্রূষা করিতে আদেশ দিয়া এবং মনে মনে সদানন্দকে নরকে প্রেরণ করিতে করিতে হলধর চূড়ামণি চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অদ্য সন্ধ্যা হইতে সদানন্দের বাটীতে অনেক লোকজন যাতায়াত করিতেছে। লোকে মনে করিতে পারে যে, সদানন্দের বাটীতে বোধ হয় কোন নিমন্ত্রণাদি ব্যাপার আছে। কিন্তু সকলের জানা উচিত যে, সদানন্দের তিন পুরুষের মধ্যে এমন কোন সৎকার্য্য ভিটার উপর সম্পন্ন হয় নাই। সদানন্দের বিবাহের সময় সদানন্দের মাতার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, দশজন আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন, কিন্তু সদানন্দের পিতা গৃহিণীর সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে দেন নাই। আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে মাখামাখি করিলে পরিণামে "এটা দাও, সেটা দাও" বলিয়া বিশেষ বিরক্ত করিবে, এই ওজর করিয়া সদানন্দের পিতা গৃহিণীকে নিরস্ত করেন। সদানন্দের ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় সদানন্দের পিতামাতার মৃত্যু হয়। সদানন্দ পিতার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পিতারই কার্য্যকলাপের অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। সদানন্দের পিতৃমাতৃবিয়োগের

কিছুদিন পরে সদানন্দের স্ত্রীর একবার জ্বর হয়। সদানন্দ বৈদ্য ডাক্তার না ডাকিয়া স্ত্রীকে লঙ্ঘন দিয়া থাকিতে বলে। লঙ্ঘনই যে জ্বরের একমাত্র ঔষধ, সদানন্দ স্ত্রীকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয়। একদিন, দুইদিন, তিনদিন, লঙ্ঘনে কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিবসে জ্বরের প্রকোপ বাড়িল। সেই জ্বরে সদানন্দের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সদানন্দের স্ত্রী একবার বৈদ্যকে ডাকিতে সদানন্দকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সদানন্দ প্রাণ থাকিতে এমন গর্হিত কাজ কখনই করিতে পারে না, কাজেই বিনা চিকিৎসায়, বিনা ঔষধে সদানন্দের স্ত্রী ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি তিলকাঞ্চনেই সমাধা হইয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর সদানন্দকে একজন পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতে হয়। তাহাতেই সদানন্দের কিছু বাজে খরচ হইতে আরম্ভ হয়, এবং সেই জন্যই সদানন্দ স্ত্রীর মৃত্যুতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিলে এই বাজে খরচটা হইত না, এই ভাবিয়া সদানন্দ কখন কখন স্ত্রীর মৃত্যু-জনিত কষ্ট অনুভব করিত। সদানন্দ আর বিবাহ করে নাই। সদানন্দের পুত্র কন্যা কিছু ছিল না। কাজেই সদানন্দের বাটীতে কখনও কোন কাজকর্ম্ম হয় নাই। কখনও বাটীতে কোন লোক জনের নিমন্ত্রণ হয় নাই। অন্য লোক জনের গতায়াতে অন্য লোকে যাই ভাবুক, আমরা জানি, অন্য অনেক লোকের সর্ব্বনাশ। সদানন্দ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামে নালিশ করিয়াই আপন খাতকদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দেয় যে, খাতকগণ সকলে আপন আপন টাকা সমস্ত চুকাইয়া দিয়া যাইবে; না দিলে, আপোসে আর কাহারও নিকট টাকা লওয়া হইবে না; নালিশ করিয়া সমস্ত টাকা, আসল মায় সুদ আদায় করা হইবে। এই কথা শুনিয়া খাতক

গণ দলে দলে সদানন্দের বাটীতে আসিতে লাগিল। খাতকগণের কাতরোক্তিতে সদানন্দের বাটী পরিপূর্ণ হইল। সদানন্দের কর্ণ কাতরোক্তিতে বধির। যাহাদের যাহাদের নামে নালিশ হইবার স্থির হইল, তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। দেনা শোধের কোন উপায় নাই। সদানন্দ ভদ্রাসন বাটী নিশ্চয়ই বেচিয়া লইবে, গাছতলায় স্ত্রীপুত্র লইয়া আশ্রয় লইতে হইবে, এই ভাবিয়া তাহারা চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিল। এই সমস্ত লোকের কাতরোক্তিতে সদানন্দ অণুমাত্র বিচলিত হইল না। বিচলিত হওয়া সদানন্দের স্বভাবের বিরুদ্ধ। কাজেই সদানন্দের হৃদয়ে কাহারও বিলাপ বাক্য স্থান পাইল না। কৃপণের অগ্রণী সদানন্দের হৃদয় প্রস্তরবৎ কঠিন। খাতকগণ কেহ বা ক্রন্দন, কেহ বা ক্রোধ প্রকাশ, কেহ বা অভিসম্পাত করিতে করিতে সদানন্দের বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৈদ্য হলধর চূড়ামণি বাটী হইতে চলিয়া গেলে সুকুমারী আপনাদিগের অবস্থার বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল। পিতার সমূহ পীড়া। কি যে অদৃষ্টে আছে, বলা যায় না। এদিকে সংসার আর চলে না। কোন রূপে মাতার ও আপনার একবেলা আহার চলিতেছে। আহা, দরিদ্র কুলীনকন্যা, স্বামিগৃহ কোথায়, তাহা পর্য্যন্ত জানে না। কখনও যে আর স্বামীর সহিত দেখা হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। অথচ সে নিজে

পরমা সতী। অদৃষ্টচক্রে দশ জনের কাছে সুকুমারী আজ অসতী-শ্রেণী মধ্যে পরিগণিতা; বিনা দোষে পিতা সমাজচ্যুত। আপনাকে আজীবন কলঙ্কের মালা ধারণ করিয়া দিন যাপন করিতে হইবে। সকলই সুকুমারীর সহ্য হইতে পারে, কিন্তু দেনার দায়ে পিতার আসন্ন মৃত্যু সুকুমারীর অসহনীয়। সুকুমারীর জন্যই পিতার দেনা এবং সেই জন্যই পিতার অকাল মৃত্যু, সুকুমারীর এ ভাবনা শত বৃশ্চিক দংশনের অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক। যে পিতা সুকুমারীর জন্য সর্ব্বসুখে বলিদান দিয়াছেন। যে পিতা সুকুমারীর সুখের জন্য প্রাণ দিতেও কুন্ঠিত নহেন, সেই পরম স্নেহময় পিতা সামান্য দেনার দায়ে, আদালতে গমনের ভয়ে, ভদ্রাসন বিক্রয়ের আশঙ্কায়, সদানন্দের ভবিষ্যৎ কঠিন ব্যবহারের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি অন্তরে কল্পনা করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছেন। এই ভাবনা সুকুমারীর কোমল হৃদয়কে যেন শতধা বিদীর্ণ করিতে-ছিল। সুকুমারীর সেই সুন্দর মুখ খানি আজ ভয়ে শুষ্ক, প্রফুল্ল নয়ন দুটী আজ কালিমায় ব্যাপ্ত, গণ্ডদেশ শ্রীহীন, যেন নিদাঘ-তপনতাপে কোমল মালতীমালা শীর্ণবিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাত্রি অনেক হইয়াছে, সুকুমারীর চিন্তার শেষ নাই। সুকুমারী চিন্তা করিতে করিতে কি ভাবিয়া কাহাকে কোন কথা না বলিয়া অন্ধকার আশ্রয় পূর্ব্বক বাটী হইতে বহির্গত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই দিন সন্ধ্যা হইতে সদানন্দের বাটীতে খাতকের জনতা হইতে আরম্ভ হয়। রাত্রি দশ, সাড়ে দশ পর্য্যন্ত সদানন্দের সহিত খাতকগণের কথাবার্ত্তা চলে। পরে খাতকগণ চলিয়া গেলে, সেদিন কত টাকা আদায় হইল, সেই হিসাবটা সদানন্দ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল। সদানন্দের বাজে খরচে বড় ভয়। সেই জন্য মুহুরী ইত্যাদি না রাখিয়া নিজেই হিসাব নিকাশের কার্য্য করিত। অন্য ভয়, পাছে মুহুরী টাকাকড়ি ভাঙ্গে, হিসাবে গোল করে। নিজের হাতে হিসাবাদি থাকিলে কোন আশঙ্কার কারণই থাকিতে পারে না। মন সদাই সচ্ছন্দে থাকে। সদানন্দের সম্পত্তি অনেক। অনেক জমিজারাৎ। কোম্পানির ঘরে ঢের টাকা। তার সুদ আসে। তেজারতি হইতে সুদ আসে। জমীদারী হইতে খাজনা, ধানচাল আসে। সদানন্দের এই লইয়াই সময় কাটিয়া যায়। কাজেই তাহার প্রতিবাসিগণের সহিত মিশামিশির অবকাশ ছিল না। ইচ্ছাও বড় একটা ছিল না। কখনও কাহারও বাড়ীতে বেড়াইতে যাওয়া ছিল না; সুতরাং পাড়ার সকলকে সদানন্দ বড় একটা চিনিত না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহাদের সহিত কারবার আছে, সদানন্দ তাহাদিগকেই চিনিত। রাত্রি বারটা বাজিয়াছে; এখনও সদানন্দ মাথা গুঁজিয়া হিসাব মিলাইতেছে। সম্মুখে প্রদীপ একটী মিটুমিটু

করিয়া জ্বলিতেছে। এমন সময় একটী পরমাসুন্দরী কুলকামিনী ধীরে ধীরে সদানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। সদানন্দ হঠাৎ পশ্চাৎদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল যে, একটী অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রমণী তাহার পশ্চাৎ দিকে দণ্ডায়মানা। এই নিশীথসময়ে অকস্মাৎ সেই অনুপম রূপরাশি লইয়া তাহার গৃহে কে আগমন করিল? সেই রূপ দর্শনে সদানন্দের মনে কি যেন কি ভাবের উৎপত্তি হইল। গৃহলক্ষ্মী সদয়া হইয়া সদানন্দকে দর্শন দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, এই ভাবিয়া সদানন্দের সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইল। নতুবা এ সময়ে তাহার গৃহে অন্য কোন্ রমণীর আগমন সম্ভব? তখনও পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব এদেশবাসীর হৃদয়কে এতদূর নাস্তিকতায় পরিণত করে নাই। সে সময় লোকে সহজেই দেবদেবীকে বিশ্বাস করিত। গৃহলক্ষ্মী ঝাঁপিকক্ষে কোন হতভাগ্যের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অন্য কোন ভাগ্যবানের বাটীতে প্রবেশ করিতেছেন, এই ব্যাপার অনেকের চক্ষে তখন পতিত হইত। প্রায় সকল বাটীতেই নারায়ণ প্রভৃতি গৃহদেবতার পূজা হইত। সন্ধ্যার সময় গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি ও আরতির সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের বাদ্যে গ্রাম আন্দোলিত হইত। সদানন্দ সম্মুখে গৃহলক্ষ্মীকে সমুপস্থিত দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "মা গৃহলক্ষ্মী, দাসের প্রতি কি আদেশ? আজি আমি ধন্য হলাম, আমার গৃহ পবিত্র হইল, সন্তানের প্রতি মাতার কি আদেশ?" রমণী উত্তর করিল, "সদানন্দ, আমি দেবী নহি, আমাকে তুমি মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলে, অদ্য হইতে তুমি আমার পুত্রস্থানীয় হইলে। আমি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কন্যা, আমার নাম সুকুমারী, আমি বিশেষ প্রয়োজন বশতঃই তোমার

নিকটে আসিয়াছি। আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে।" সদানন্দের হৃদয় তখনও ভয় ও বিস্ময়ে জড়িত ছিল। সে যেন এতক্ষণ স্বপ্নাবস্থায় ছিল, হঠাৎ জাগরিত হইল। এতক্ষণ যেন কোন দেবতার সম্মুখে উপস্থিত ছিল। এক্ষণে একটী সামান্য স্ত্রীলোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে বুঝিয়াও সদানন্দের মনে যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উৎপত্তি হইল। সুকুমারীর অলোকসামান্য রূপরাশি, তাহার সরলতা জড়িত প্রশান্ত মূর্ত্তি, সদানন্দ যতই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার মনের জড়তা দূরীভূত হইয়া মন শৈশবের সারল্যে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। যেন সে এতদিন পূতিদুর্গন্ধময় নরকে বাস করিতেছিল, সহসা কোন দৈববলে কুসুম-সৌরভ সমাকুল নন্দন-কাননে উপস্থিত হইল। পর্ব্বত-কন্দর-স্থিত কঠিন তুহিনরাশি যেমন প্রভাত-সূর্য্যরশ্মি-প্রভাবে অল্প অল্প গলিতে থাকে, সদানন্দের বজ্রময় হৃদয় আজ এই বালিকার অতুল সৌন্দর্য্যে, বালিকার সুমধুর সম্ভাষণে গলিয়া গেল। যেন বহুদিনের যন্ত্রণাময় রোগ হইতে রোগী দৈব ঔষধ প্রভাবে সহসা রোগোন্মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যের সুখ অনুভব করিল। সদানন্দ পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "তুমিই মা আমার গৃহলক্ষ্মী, তুমিই আমার মাতা, আজ আমি জানি না কিসের জন্য আমার মনঃ শিশুকালের সুখ অনুভব করিতেছে। যেন আমি আমার মাতার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়া মাতার স্নেহ-মাখা বচন শুনিতেছি, মাতার স্নেহলাভে মনঃ যেন আবার ব্যগ্র হইতেছে। মা, তুমি যেই হও, আজ হইতে তুমি আমার মা হইলে, আজ হইতে আমি শিশুপুত্রের ন্যায় তোমার আজ্ঞানুসারী হয়ে জীবন যাপন করিব।" সদানন্দ এই কথা বলিতে বলিতে শিশুর

ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। আজি যেন কোন দৈববলে তাহার হৃদয়দেশ বলীয়ান্ হইল। সদানন্দের হৃদয়ে যেন কি অনির্ব্বচনীয় সুখের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বের নির্দ্দয় কার্য্যের কথা যত স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল, ততই সদানন্দের মনঃ ব্যাকুল হইতে লাগিল। পথহারা বালক মাতাকে পাইয়া যেমন দুঃখে হর্ষে কাঁদিয়া ফেলে, সদানন্দ আজ সেইরূপ কাঁদিল। সুকুমারী সদানন্দের সেই ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইল এবং বলিল, "সদানন্দ, অদ্য হইতে আমি তোমার মাতৃস্থানীয়া হইলাম, আমি তোমাকে একটী অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলাম।" সদানন্দ বলিল, "মা, অনুরোধ বলিবেন না, আদেশ বলুন"। সুকুমারী বলিল, "আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, পাড়ার লোকে তাঁহাকে নানা প্রকারে অপদস্থ করায় ঘৃণায় লজ্জায় তিনি অভিভূত হইয়া জ্বর-গ্রস্ত হয়েন; জ্বর কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, তিনি যখন শুনিলেন যে, তুমি তাঁহার নামে নালিশ করিয়াছ, তিনি অমনি অজ্ঞান হইলেন। এপর্য্যন্ত তিনি সেই ভাবেই আছেন। আমার অনুরোধ তুমি এক্ষণে মোকদ্দমা না করিয়া দেনা পরিশোধের জন্য পিতাকে কিছু দিনের সময় দেও। আমরা যে রকমে পারি সুদ সমেত তোমার সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব।" এই বলিয়া সুকুমারী সদানন্দের উত্তর শুনিবার জন্য সন্দেহ-দোলায়মান-হৃদয়ে সদানন্দের প্রতি চাহিয়া রহিল। সদানন্দ পূর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমাজচ্যুত হইবার কথা শুনে নাই। যাহাতে আপনার লভ্য নাই এমন বিষয়ে সদানন্দ কখনও কর্ণপাত করিত না। করিবার সময়ও ছিল না, আপনার কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত। এই জন্য সদানন্দ সুকুমারীর পিতাকে কেন পাড়ার লোক অপদস্থ

করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল না। মোকদ্দমা স্থগিত রাখিবার কথা শুনিয়া সদানন্দ বলিল "আমি এপর্য্যন্ত কাহারও অনুরোধে মোকদ্দমা স্থগিত রাখি নাই, কিন্তু তুমি আমার মা—এ সমস্ত সম্পত্তি তোমার, আমি কল্যই আদালতে গিয়া মোকদ্দমা উঠা-ইয়া লইব। তোমার পিতাকে আর আমার টাকা শোধ দিতে হইবে না। তোমার পিতার সম্মুখে দলিলাদি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিব। তিনি অদ্যই এ ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন আপনি পিতাকে এই সমস্ত বিষয় অবগত করুন, আমার আর টাকার আবশ্যক নাই"। সরলা বালিকা ঘোর বিষয়ী সদানন্দের মনের সহসা এতাদৃশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইল; এবং সদানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পিতাকে উক্ত সুসংবাদ দিবার জন্য ত্বরিতপদে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সদানন্দ কতক দূর সুকুমারীর সঙ্গে আসিয়া নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বাটী প্রত্যাগমন করিল।

সুকুমারীর মনে বড় সাধ যে, বাটী গিয়া পিতাকে দেনার দায় হইতে মুক্তির কথা জানাইবে। সুকুমারী অদ্য রাত্রে যে অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছে, অন্য সময় হইলে তাহাতে তাহার মনে কত লজ্জা ও কত ভয়ের উদ্রেক হইত; কিন্তু পিতা সুখী হইবেন, এই ধারণা মনোমধ্যে জাগরূক থাকায় সুকুমারীর মনঃ অতিশয় প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু সুকুমারীর দুরদৃষ্ট বশতঃ সুকুমারী পিতাকে উক্ত সুসংবাদ শুনাইতে পারিল না। বাটী প্রবেশ করিয়াই সুকুমারী দেখিল তাহার পিতা উঠানের উপর মৃত্যুশয্যায় শয়িত। বৈদ্যপ্রভৃতি কয়েক জন প্রতিবাসী পিতার নিকট বসিয়া আছেন। সুকুমারীর মাতা এক পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছেন।

সুকুমারী পিতার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুকুমারী যে এতক্ষণ কোথায় ছিল, তাহার কেহ খবর লয় নাই। সকলেই সুকুমারীর পিতাকে লইয়া ব্যস্ত ছিল। সুকুমারী যে পিতার জন্য এতদূর বিপদ্ মাথায় করিয়া একাকিনী নিশীথসময়ে সদানন্দের সহিত দেখা করিতে সাহসী হইয়াছিল, যে পিতার রোগ উপশমের জন্য সুকুমারী নিজের হৃদয়ের রক্ত পর্য্যন্ত দিতে সঙ্কুচিতা হইত না, সুকুমারীর সেই স্নেহময় পিতা অদ্য মৃত্যুশয্যায় শয়িত। সুকুমারী কতবার পিতা পিতা বলিয়া ডাকিল, ইচ্ছা সদানন্দের দেনা হইতে মুক্তি সংবাদ পিতাকে বলে; কিন্তু সুকুমারীর সকল আশা বিফল হইল। দুঃখিনী সুকুমারীর আজ আর দুঃখের অবধি নাই। বৈদ্য ক্ষণে ক্ষণে নাড়ী দেখিতেছেন ও মুখ বিকৃত করিতেছেন। রাত্রি তিনটার সময় "আদালত, সদানন্দ" এই দুই কথা শেষ উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায় গৃহিণী ও সুকুমারীকে অকুল ভবসাগরে ভাসাইয়া ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। সুকুমারীর মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল। সুকুমারীর এ দুঃখ মরিলেও যাইবার নয়। সুকুমারী পিতাকে মনের কথা বলিতে পারিল না এ অপেক্ষা যাতনার বিষয় আর কি হইতে পারে? সুকুমারী ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে; কে তাহার খবর লয়? কে তাহাকে সান্ত্বনা করে? এই সংসারে মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ জন্ম বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা আজ সুকুমারীর অবস্থা দেখিলে কি বলিতেন, বলিতে পারি না। আমরা বলি মনুষ্য সকল জীব অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য ও মনুষ্য জন্ম সকল জন্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট জন্ম।

নবম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইল। সদানন্দ নিজ ব্যয়ে বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়াছিল। যে সদানন্দ পিতার শ্রাদ্ধে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করে নাই, সে পরের শ্রাদ্ধের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছে, একথা কাহারও প্রথম বিশ্বাস হয় নাই। পরে যখন শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ভারে ভারে আসিতে লাগিল, তখন গ্রামের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কত লোক কত কাণাঘুসা করিতে লাগিল। সদানন্দের সহিত সুকুমারীর কোন অবৈধ সম্বন্ধ সংস্থাপন হইয়াছে—এইরূপ জল্পনা হইতে লাগিল। কিন্তু সদানন্দকে সুকুমারীকে মাতৃ-সম্বোধনে ডাকিতে শুনিয়া সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। অথচ কি কারণে কৃপণের অগ্রগণ্য সদানন্দ এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইল। সুকুমারী রাত্রিতে যে একাকিনী সদানন্দের বাটীতে গমন করিয়াছিল তাহা সুকুমারীর মাতা ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারে নাই, কাজেই সদানন্দের মনের পরিবর্ত্তন সকলেরই বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। পাড়ার ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ শ্রাদ্ধে যোগ দিতে বিশেষ আপত্তি করেন। পরে শ্রাদ্ধের সুচারু বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া বিশেষতঃ উচ্চ হারে দক্ষিণার ব্যবস্থা শুনিয়া কাহারও আর কোনও আপত্তি থাকিল না। সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে পুত্র পৌত্র, আত্মীয়স্বজন লইয়া ভোজনাদিক্রিয়া শেষ করিয়া গেলেন। শ্রাদ্ধের দুই চারি দিন পূর্ব্বে পাড়ায় পাড়ায় ঘোঁট

হইতে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্র রায় দ্বিচারিণী কন্যাকে বাটীতে রাখিয়া তাহার সহিত আহারাদি করিয়াছেন, তাঁহার শ্রাদ্ধে কি প্রকারে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যাইতে পারে এই রূপ নানা প্রকার তর্ক উঠে। রায়পুর গ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামনিধি তর্কবাগীশের বাটীতে এক সভা আহুত হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এবং তাঁহার প্রধান বিদায় পাইবার কথা ও তাহা যে বিশেষ মূল্যবান একথা তিনি ও গৃহিণী জানিতেন। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী বিদায়ের ঘটা শুনিয়াই স্থির করেন যে কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে একঘরে করিয়া পাড়ার লোকে অতীব গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। সুকুমারীকে যে অসতী বলে বা সন্দেহও করে, তাহার নরকেও স্থান হইবে না। সুকুমারীর মত মেয়ে যে সংসারে দুর্ল্লভ, তাহারও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া স্বামীকে আপন সিদ্ধান্তের বিষয় সবিশেষ অবগত করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনঃ বিদায়ের কথা শুনিয়াই টলিয়া রহিয়াছিল, এক্ষণে গৃহিণীর অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রভাবে তাঁহার মনঃ হইতে সকল দ্বিধা একেবারে দূর হইয়া গেল। তিনি আপন ঘর বাঁধিয়া সভায় যোগ দিলেন। গৃহিণী বক্র থাকিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজ ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। এক্ষণে গৃহিণীর পোষকতা পাইয়া নৈয়ায়িক মহাশয় সভাস্থলে ঘোর রবে তর্ক আরম্ভ করিলেন এবং সমবেত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কি দোষে কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সমাজচ্যুত করিয়াছেন? গ্রামের প্রধান কুলীন কৃপারাম শর্ম্মা একথা শুনিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে যখন সমাজচ্যুত করা হয়, তখন কি ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার দোষের কথা শুনেন নাই? ভট্টাচার্য্য

মহাশয় বলিলেন "আমি তোমাদের বলিয়াছিলাম সহসা একটা কাজ করা উচিত হয় না। দুই চারি দিন বিবেচনা করিয়া যাহা করা যুক্তিসঙ্গত হয় তাহা করা যাইবে।

কৃপা। "সেকি ভট্টাচার্য্য মহাশয়? কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সমাজ-চ্যুত করিবার প্রস্তাব হইলে আপনি তিন চারি দিন বিবেচনার পর উত্তর দিবেন এই কথা বলেন। পরে, তিন চারিদিন অতীত হইলে আপনি তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করিলে আমরা সকলে কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সমাজ-চ্যুত করিয়াছি। আপনার মত অনুসারেই তাঁহাকে আমরা সমাজচ্যুত করি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন আমতা আমতা করিয়া বলিলেন "তা হইতে পারে আমার বিশেষ স্মরণ হইতেছে না। কিন্তু "গৃহিণী" বলিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "পরে বিবেচনা করিয়া দেখা গেল যে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কোন দোষ নাই। তাহার কন্যার কোন দোষের কথা দূরে থাকুক মেয়েটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; যেমন রূপ তেমনি গুণ। তাহার গুণে দুষ্ট সদানন্দও বশীভূত হইয়াছে—তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছে—এই প্রচুর ব্যয়ভার নিজ স্কন্ধে লইতে স্বীকার করিয়াছে এ অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নির্দ্দোষিতার অধিক কি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে? গ্রামের সকলেরই মন শ্রাদ্ধের দিকে ঢলিয়া রহিয়াছিল কাজেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যুক্তি অকাট্য বলিয়া তাহাদের এক্ষণে মনে হইল। কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে একঘরে করা অতি গর্হিত কার্য্য হইয়া-ছিল বলিয়া স্পষ্টই সকলের বোধ হইতে লাগিল। কত লোক কতরূপ দুঃখ প্রকাশ করিল। সকলেই সুকুমারীকে সতীপ্রধানা

বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। এবং এই কন্যারই গুণে যে কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। এমন কি সম্ভব হইলে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের শ্রাদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করা ত সামান্য কথা তাঁহার পাতের উচ্ছিষ্ট খাইতেও বোধ হয় এখন কাহারও কোন আপত্তি থাকিত না। সেই সভার সকলে একবাক্যে কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেবতুল্য লোক বলিয়া স্থির করিলেন। কৃপারামের আপত্তি টেঁকিল না। দক্ষিণার কথা মনে পড়ায় কৃপারামের পক্ষে যোগ দিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক, বড়লোক, তিনি কি না বুঝিয়াই এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তাঁহার কথাই ঠিক, তাঁহার কথা অবহেলা করা বিশেষ অকর্ত্তব্য; এইরূপ মত প্রকাশের পর সভা ভঙ্গ হইল। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের শ্রাদ্ধে সকলে যোগ দিবেন স্থির হইয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহিণীকে সকল বিষয় জানাইলেন। গৃহিণী যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা প্রকারন্তঃ জানাইলেন। গৃহিণী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহিণীর বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। উভয়ে উভয়কে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন। বড়ই আনন্দে সেদিন কাটিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রাদ্ধ শেষ হইলে পর সদানন্দ সুকুমারী ও তাহার মাতাকে আপন বাটীতে বিশেষ যত্ন সহকারে লইয়া গেল। সদানন্দ সুকুমারীর প্রতি মাতার ন্যায় প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং সমস্ত বিষয়ে সুকুমারীর মত লইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। সুকুমারীর ইচ্ছানুযায়ী সদানন্দ বিশেষ দরিদ্র খাতকগণের সুদ একবারে রেহাই দিল। অপর খাতকগণের নিকট হইতে কমহারে সুদ লওয়া হইতে লাগিল। কাহাকেও কাহাকেও আসলের টাকা হইতে কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কাহাকে কাহাকে সদানন্দ সুদে আসলে সমস্ত টাকা ছাড়িয়া দিল। সুকুমারীর অনুরোধে অনেকে আপন আপন ভদ্রাসন বাটী ফেরৎ পাইল। যে টাকা দিতে পারিল দিল, নতুবা অনেক দীনদরিদ্র ভদ্রাসন বাটী অমনি ফেরৎ পাইল। পরন্তু রায়পুরের অধিবাসিগণের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। সুকুমারীর ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইল। সকলের মুখেই সুকুমারীর প্রশংসার কথা; সুকুমারীর কলঙ্কের কথা কেহ আর বিশ্বাস করিল না। এমন গুণবতী রমণী আপন সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে ইহা কেহ মনে স্থান পর্য্যন্ত দিতে চাহিল না। সুকুমারী নিজ বাটী হইতে আগমন কালে তুলসী বৃক্ষটী সদানন্দের বাটীতে আনিতে বিস্মৃত হয় নাই। এখানেও প্রত্যহ তুলসী-চরণে মালা গাঁথিয়া দিতে সুকুমারীর আলস্য নাই। সুকুমারী নারায়ণের নিকট স্বামীর উদ্দেশে কত কি প্রার্থনা করে। আত্মীয় স্বজনের তৎসঙ্গে গ্রামের মঙ্গল যাচ্ঞা করে।

সুকুমারী সদানন্দকে বলিয়া একটী সুন্দর তুলসী-মন্দির নির্ম্মাণ করায়। মন্দির নির্ম্মাণ হইলে অতি সযত্নে তুলসী বৃক্ষটী সেই মন্দিরে স্থাপন করে ও তৎসঙ্গে একটী স্বর্ণনির্ম্মিত লক্ষ্মী-জনার্দ্দন নির্ম্মাণ করিয়া সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে। লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের ভোগের রীতিমত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যহ লোকজন আসিয়া লক্ষ্মীজনার্দ্দনের প্রসাদ পাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় জনার্দ্দনের যথাবিধ আরতি হইতে লাগিল। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আরতি দেখিতে আসিতে লাগিল। শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্যের ধ্বনিতে ও লোকজনের কলরবে রায়পুর গ্রাম এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। সুকুমারী সদানন্দের বাটীতে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; কিন্তু সুকুমারীর ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষা নাই। গৈরিক বসন ভিন্ন সুকুমারী অন্য বস্ত্র পরে না। একসন্ধ্যা আহার করে। বলে যাহাকে স্বামী ত্যাগ করিয়াছে তাহার আবার বেশভূষা আহারাদির প্রয়োজন কি? আমি দুঃখিনী কুলীনকন্যা আমার মনোমধ্যে সুখের সাধ কেন হইবে? সুকুমারীর মাতা ও সদানন্দ সুকুমারীকে অনেক বুঝাইয়াছিল; সুকুমারী কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। সুকুমারীর মাতা চিরদিন বুদ্ধিহীনা—তিনি সুকুমারীকে কতদিন অলঙ্কার গড়াইতে উপদেশ দিয়াছিলেন; কতদিন কত তিরস্কার করিয়াছিলেন। সুকুমারী সে কথায় হাসিত, বলিত কুলীনের মেয়ের অদৃষ্টে আবার কত সুখ হইবে? যা হইবার ঢের হইয়াছে। সুকুমারী স্বামীবিরহে সতত বিষাদিতা বুঝিতে পারিয়া সদানন্দ সুকুমারীর স্বামীর উদ্দেশে অনেক স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছিল; কিন্তু কোথাও তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জনার্দ্দনের প্রসাদ পাইবার জন্য লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জনার্দ্দনের ভোগের আয়োজনও সুকুমারীর ইচ্ছানুসারে সদানন্দ দিন দিন বাড়াইয়া দিতে লাগিল। পরে জনার্দ্দনের মন্দিরের সম্মুখে এক অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিতে হইল। নতুবা লোকজনের বসিবার ও থাকিবার বড়ই অসুবিধা হয়। আগন্তুক আসিয়া অতিথিশালায় বিশ্রাম করিত ও জনার্দ্দনের প্রসাদ খাইত। এইরূপে কত সন্ন্যাসী কত দরিদ্র নিরন্ন লোক আসিয়া অতিথিশালায় আশ্রয় লইতে লাগিল। সদানন্দ সুকুমারীর বাক্য দৈববাণীর ন্যায় মান্য করিত। সুকুমারী সৎকার্য্যে অর্থব্যয় না করিলে মনুষ্য জন্মই বৃথা এই উপদেশ সর্ব্বদা সদানন্দকে প্রদান করিত। সদানন্দও সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। সেই বৎসর ভাল বৃষ্টি না হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। লোকজন অন্নাভাবে দশদিক্ ছুটিতে লাগিল। সকল স্থানেই হাহাকার পড়িল। সকলেরই মন বিষাদে পরিপূর্ণ। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে এই ভয়ে ও ভাবনায় আকুল। দিনকতক আরও বৃষ্টি না হইলে লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে সকলেই এই ভয়ে ব্যাকুল। দেবতা কিন্তু প্রসন্ন হইলেন না। বৃষ্টি হইবার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। জনার্দ্দনের অতিথিশালায় লোক আর ধরে না। সুকুমারী অকাতরে অন্ন বিলাইতেছে। লোকে সুকুমারীকে ও তৎসঙ্গে

সদানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সদানন্দ কখনও পূর্ব্বে কাহারও নিকট হইতে আশীর্ব্বচন শুনে নাই। অভিসম্পাতের কর্কশ বচন শ্রবণে সদানন্দের শ্রবণ-যুগল বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। সৎকার্য্য জন্য আশীর্ব্বচন শ্রবণে হৃদয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হয় সদানন্দ এক্ষণে তাহা উপলব্ধি করিতে লাগিল এবং সুকুমারীই যে তাহার এই আনন্দ লাভের কারণ তাহা ভাবিয়া সুকুমারীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা দিন দিন আরো বাড়িতে লাগিল। অন্নাভাবে মৃতবৎ দরিদ্রগণ প্রচুর অন্ন পাইয়া পরম পরিতোষ সহকারে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে চতুর্দ্দিকে লোকের কলরব চারিদিকে লোকের প্রশংসাসূচক বাক্য সদানন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। আজ যেন কোন শ্মশানপুরী কোন মহামন্ত্রবলে লোকজন পরিপূরিত নয়নরঞ্জন নগরে পরিণত হইয়াছে। যে সদানন্দের বাটীতে খাতক ভিন্ন অন্য কেহ যাইতে চাহিত না, অদ্য তথায় লোক ধরে না। সুকুমারীরও আনন্দের সীমা নাই। আহা সেই নিরলঙ্কারা, গৈরিক বসন পরিহিতা, অষ্টাদশ-বর্ষীয়া ললনা এই যৌবনে আপনার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরদুঃখমোচনে সতত তৎপর। পরের দুঃখে সুকুমারী বড়ই ব্যথিতা। বঙ্গললনা বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এরূপ স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতে বড়ই বিরল। বঙ্গললনা ভিন্ন আজীবন এরূপ আত্মসুখ বলিদানে আর কে সক্ষম? এই মহাব্রত আজী-বন হৃদয়ে ধারণ করিয়া শুধু বঙ্গললনাই চিতার জ্বলন্ত ক্রোড়ে এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন করে।

আপনার শরীরের প্রতি সুকুমারীর কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, যত্ন নাই, সেই অতুল রূপরাশির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। কেবল পরসেবা,

পরদুঃখমোচন এই মহামন্ত্র দিবানিশি হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সদানন্দের পরম ভাগ্য যে এরূপ গৃহলক্ষ্মী সদানন্দের গৃহে বিরাজমানা। সদানন্দের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন্ পুণ্যফলে আজি সুকুমারী তাহার গৃহে অধিষ্ঠিতা তাহা কে বলিতে পারে? সদানন্দ বিশেষ ভাগ্যবলে সদ্‌গুরু সুকুমারীকে প্রাপ্ত হইয়াছে। সদানন্দ অনন্ত নরকের পরিবর্ত্তে চির-স্বর্গসুখের অধিকারী ইহা অপেক্ষা অধিক ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? সদানন্দের সুকুমারীর কথা লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। তাহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনে সদানন্দ পরম সুখ অনুভব করে। সুকুমারীর মনের বাসনা পূরণই সদানন্দের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুকুমারী লোকজনের আহারের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকে। স্বয়ং স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করে। পাছে পরিচারকবর্গ কার্য্যে কোনরূপ অবহেলা প্রদর্শন করে এই জন্য সুকুমারী মহাভীতা। অতিথিগণ সুকুমারীকে স্বয়ং অন্নপূর্ণার অংশ জ্ঞানে মাতৃসম্বোধনে ভক্তি প্রদর্শন করে। তাহাতে সুকুমারী বড়ই লজ্জিতা। সুকুমারী উপস্থিত থাকিলে অতিথিগণের আহারে অধিক পরিতোষ হয়। সুকুমারী এই সমস্ত দৈনিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া অপরাহ্নে অন্ন গ্রহণ করে। তাহাতে সুকুমারীর মাতা বড়ই ক্ষুব্ধ; তাঁহার ইচ্ছা সুকুমারী সকাল সকাল আহার করে। বেশভূষায় সুকুমারী যত্নবতী হয়। অপরে অতিথির পরিচর্য্যা করে। কিন্তু সুকুমারী তাহাতে ক্ষণমাত্র সম্মত নহে, কাজেই সুকুমারীর মাতা বিশেষ দুঃখিতা। সুকুমারী পরসেবায় কিছুমাত্র ক্লান্তি অনুভব করে না। সেই দুর্ভিক্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে অতিথির সংখ্যা যতই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সুকুমারী আহার

নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অতিথিগণের সন্তোষসাধনে দিন দিন অধিকতর যত্নবতী হইল।

একদিন মধ্যাহ্নে সুকুমারী পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় লোকজনের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছিল; অদ্য অনেক লোক হইয়াছে। শীর্ণজীর্ণকায় নরনারী ক্ষুধাতৃষ্ণায় মৃতকল্প তনয় তনয়ার সহিত আহারের জন্য দলে দলে অতিথিশালার প্রাঙ্গণভূমি অধিকার করিয়াছে। স্থানান্তরে কতক খাইতেছে। কতক স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া আছে ও সতৃষ্ণনয়নে অপরের আহার লক্ষ্য করিতেছে; ক্ষুধায় কাতর, আর বিলম্ব সহিতেছে না, দাও দাও, শব্দে গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুকুমারী বিশেষ ব্যস্ত। অঞ্চলে কোমর বাঁধিয়া স্বয়ংই পরিবেশন করিতেছে। এদিকে দাও, এদিকে দাও, শব্দ চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইতেছে। দশ পনর জন পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এমন সময় ব্রাহ্মণ অতিথিগণের মধ্য হইতে, ভাত নাই, বলিয়া একটী কৃষ্ণকায় লোক চীৎকার করিয়া উঠিল। সুকুমারী স্বয়ং ভাতের থালা হাতে করিয়া সেই দিকে ছুটিল। পরিশ্রমে ক্ষীণাঙ্গীর অঙ্গযষ্টি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভাতের থালা হইতে যেমন ভাত লইয়া ব্রাহ্মণের পাতে দিতে যাইবেন, ব্রাহ্মণের মুখের দিকে সুকুমারীর চক্ষু পড়িল; অমনি হাত হইতে ভাতের থালা ব্রাহ্মণের পাতের উপর পড়িয়া গেল। ভাত ছড়াইয়া ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গে লাগিল। ব্রাহ্মণ রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। সুকুমারীর শরীর অবশ হইয়া পড়ায় সুকুমারী সেই স্থলে বসিয়া পড়িল। সুকুমারীর মাতা নিকটে ছিলেন, সত্বরে সুকুমারীকে ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। সুকুমারী

মাতাকে চুপে চুপে কি বলিল। সুকুমারীর মাতা সেই কথা সদানন্দকে বলিয়া পাঠাইল; সদানন্দ অতিশয় যত্ন করিয়া সেই কৃষ্ণকায় পুরুষবরকে বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইল।

ব্রাহ্মণ আদরের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; এবং ঐ বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ধূমপান করিতে লাগিলেন। সুকুমারী গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিল; এবং নির্জ্জনে বসিয়া নারায়ণকে ডাকিতে লাগিল। সুকুমারী পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে পরিবেশন করিতে গিয়া চিনিয়াছিল যে, তিনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হৃষীকেশ শর্ম্মা। হৃষীকেশ শর্ম্মা দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে এক শ্বশুরালয় হইতে অন্য শ্বশুরালয়ে যাইবার সময়ে এই অতিথিশালায় অতিথি হইয়াছিলেন। সুকুমারী যেদিন আপন পিতার বাটীতে জামাতা বিভ্রাট হইয়াছিল, সেই দিন কপাটের অন্তরাল হইতে এই গুণধরকে দেখিয়াছিল। আজ দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিল। সন্ধ্যার পর সুকুমারীর মাতা একজন দাসীর দ্বারা জামাতাকে বাটীর ভিতর আনয়ন করিলেন। হৃষীকেশ শর্ম্মার কৌতূহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাঁহার আদরের কারণ তিনি কি প্রকারে বুঝিবেন? তিনি ত আপন স্ত্রী সুকুমারীকে চিনিতে পারেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাটীতে জামাতা বিভ্রাটের দিন তাঁহার সহিত সুকুমারীর সাক্ষাৎ হয় নাই; এবং বিবাহের দিন শুভদৃষ্টির সময় ভিন্ন হৃষীকেশ শর্ম্মা সুকুমারীকে আর কখনও দেখেন নাই। কাজেই তিনি পরিবেশনের সময় সুকুমারীকে চিনিতে পারেন নাই। এক্ষণে বাটীর ভিতর গমন কালে তাঁহাকে বাটীর ভিতর কেন লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহার কারণ দাসীকে জিজ্ঞাসা

করিলেন। দাসী কোন কারণ না বলিয়া, তাঁহার সঙ্গে বাটীর ভিতর যাইলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন; এই বলিয়া হৃষীকেশ শর্ম্মাকে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। হৃষীকেশ শর্ম্মা বাটীর ভিতরে একটী গৃহে উপবিষ্ট হইলেন। সুকুমারীর মাতার বড় ইচ্ছা সুকুমারীকে সাজাইয়া গুছাইয়া জামাইয়ের নিকট প্রেরণ করেন। সুকুমারী তাহাতে সম্মত হইল না; সে দুঃখিনী কুলীনকন্যার বেশে স্বামিসন্দর্শনে গমন করিল; এবং স্বামিগৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান রহিল। হৃষীকেশ শর্ম্মা আপনি বড় কুলীন, সেইজন্য তাঁহাকে সকলে এত আদর করিতেছে, এই মনে করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইতেছিলেন। নতুবা তাঁহার প্রতি ইহাদের আদরের অন্য কি কারণ থাকিতে পারে? হৃষীকেশ শর্ম্মা এক খানি পালঙ্কের উপর আপন দেহযষ্টি বিস্তার করিয়া অনন্যমনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে সুকুমারী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। যখন সুকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিল, তখন তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলেন ও কৌতূহল-পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

সুকুমারী। আমি তোমার স্ত্রী।

হৃষীকেশ। কার কন্যা?

সুকুমারীর গা কাঁপিতেছিল; সে বলিল, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের।

হৃষী। তাঁহার ত এ-বাটী নহে।

সুকু। তাঁহার মৃত্যু হইলে পর সদানন্দ আমাকে ও আমার মাতাকে এই বাটীতে আনিয়াছে।

হৃষী। সদানন্দ তোমার কে?

সুকু। কেহই নহে, সে আমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া মাতার

ন্যায় যত্ন করে, ভক্তি করে; তাই এই স্থানে আসিয়াছি।

হৃষী। ভাল, তুমি যে আমার স্ত্রী, তাহার নিদর্শন কিছু দেখাইতে পার?

সুকু। এই আংটীটী দেখ দেখি, চিনিতে পার?

এই বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী আংটী বাহির করিয়া সুকুমারী হৃষীকেশকে দেখাইল। এই আংটীর বিষয়ই সুকুমারী শশিশেখর শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

হৃষী। বুঝিলাম, তুমি আমার স্ত্রী। তোমার আইমা এই আংটীটী আমার অঙ্গুলী হইতে খুলিয়া লয়েন। আর একটী আংটী তিনি আমার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দেন। আমার সব মনে পড়েছে। কিন্তু যে দিন তোমার বাপের বাড়ীতে আমি যাই, তাহার পূর্ব্বরাত্রে একজন লোক জামাতা বলিয়া তোমার গৃহে অবস্থান করিয়াছিল কি না?

সুকু। হাঁ, ভুল ক্রমে পিতা তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করেন।

হৃষী। তুমি তাহার সঙ্গে এক ঘরে ছিলে কি না?

সুকুমারী মিথ্যা কথা কহিতে পারে না। বলিল, হাঁ, ছিলাম, কিন্তু—

হৃষী। কিন্তু কি? পাপীয়সী, দ্বিচারিণী, তুই আবার কোন্ মুখ লইয়া আমার কাছে আসিয়াছিস্? তুই একজন পরপুরুষের সহিত রাত্রি যাপন করিলি, আর আমাকে বুঝাইতে চাস যে, তুই সতী আছিস্? তোর ছায়া মাড়াইলে অপবিত্র হইতে হয়। হয় তুই এই ঘর হইতে বাহির হইয়া যা, নতুবা আমি চল্লেম।

এই বলিয়া হৃষীকেশ শর্ম্মা ক্রোধভরে ঘরের বাহির হইতে উপক্রম করিলেন; সুকুমারী হৃষীকেশের চরণ ধারণ করিয়া কত

কাঁদিল, কত মিনতি করিল, আপনার সতীত্ব সম্বন্ধে কত শপথ করিল, কিন্তু হৃষীকেশ কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। অসতীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া সেই রাত্রেই হৃষীকেশ শর্ম্মা সদানন্দের বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। হৃষীকেশের কত কত স্ত্রী হৃষীকেশের পদ ধারণ করিয়া ঐরূপ কাঁদিয়াছে; কত স্ত্রী হৃষীকেশের নির্দ্দয় ব্যবহারে আত্মহত্যা করিয়াছে; কত স্ত্রী সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া গণিকাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে; হৃষীকেশের পক্ষে সুকুমারীর কান্নাকাটি আজ নূতন নহে। হৃষীকেশ শর্ম্মার হৃদয় সুকুমারীর কাতরোক্তিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সুকুমারীর সকলই অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইল। হৃষীকেশ শর্ম্মা চলিয়া গেলেন। সুকুমারী একাকিনী সেই গৃহে থাকিয়া কি করিবে? ধীরে ধীরে আপনার মাতার নিকট গমন করিল এবং মাতা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পুর্ব্বেই মাতার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, রায়পুরের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাটী হইতে রাইপুরের কৃষ্ণলাল রায় আপন জামাতা শশিশেখরকে লইয়া চলিয়া যান। কৃষ্ণলাল রায় আপন এক কন্যার পাত্রের অন্বেষণে পূর্ব্বদিন রায়পুর গ্রামে আসেন; এবং পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাটীতে গোলযোগ শুনিয়া কৌতূহলপরবশ হইয়া গোলযোগের কারণ কি জানিতে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাটীতে যান। কৃষ্ণলাল রায়ের বাটী রাইপুর। রাইপুর রায়পুর হইতে সাত আট ক্রোশ উত্তর। সে সময় পাল্কী বা গাড়ী কিছুই পাওয়া যাইত না। পদব্রজে রায়পুর হইতে রাইপুর যাইতে হইত। শশিশেখর কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া মনে মনে বড় খুসী হইলেন। তাহার কারণ এই যে, এদিকে ২৫টী টাকা লাভ হইয়াছে, আবার অন্য শীকার হস্তগত। কৃষ্ণলাল রায়ের বাটীতে গিয়া কোন্‌না আরো দশ পনর টাকা আদায় হইবে। এই সব মনে করিতে করিতে আপন শ্বশুরের সহিত রাইপুরাভিমুখে যাত্রা করেন এবং কথাবার্ত্তায় সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় রাইপুর গ্রামে উপস্থিত হয়েন। রাইপুর গ্রামে কৃষ্ণলাল রায় একজন মধ্যবিত্ত লোক; চাসবাস আছে; দুইটী কন্যা ও দুইটী পুত্র। শশিশেখরের সহিত একটী কন্যার বিবাহ হইয়াছে, অন্যটীর পাত্র অন্বেষণে কৃষ্ণলাল রায় গমন করিয়াছিলেন। তৃতীয় প্রহরে শ্বশুরালয়ে

আগমন করিয়া জামাই বাবু পদপ্রক্ষালনাদির মূল্যস্বরূপ দশবারটী টাকাআদায় করিয়া আহারকার্য্য সমাধা করেন। পরে আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময় জামাই বাবু সন্ধ্যাক্রিয়াদি সমাপন জন্য একটী পুকরিণীর ঘাটে গিয়া উপবেশন করিলেন। পুষ্করিণীটী বৃহৎ, জল স্বচ্ছ—নানা প্রকার জলজপুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যাসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। একটী দুইটী তারা নীল গগনে ভাসিতেছে। ভাসিতে ভাসিতে আবার যেন ডুবিয়া যাইতেছে। যেন নীলযমুনাজলে কোন সুন্দরী সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া সুন্দর মুখখানি জাগাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কখন বা ডুব দিয়া নীল জলমধ্যে মুখখানি পর্য্যন্ত লুকাইতেছে। আবার মুখখানি জলের উপর ভাসাইতেছে। প্রকৃতির সান্ধ্য-শোভা জামাই বাবুর কাছে কিন্তু পরাজয় মানিয়াছে। জামাই বাবুর মনকে আপন শোভায় আকৃষ্ট করা প্রকৃতিদেবীর সাধ্য নহে। জামাই বাবু রাত্রিতে স্ত্রীর নিকট কিরূপে টাকা আদায় করিবেন, তাহাই মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন; এবং হস্তে উপবীত জড়াইয়া মন্ত্র আওড়াইতেছিলেন। আবার ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার খেই ভুলিয়া যাইতেছিলেন; আবার গোড়া হইতে সন্ধ্যা আরম্ভ করিতেছিলেন; এবং মনোমত অর্থ না পাইলে স্ত্রীকে আপন শয্যায় শয়ন করিতে অনুমতি দিয়া তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষকে কৃতার্থ করিবেন কি না, তাহাই ভাবিতেছিলেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণতনয় কোনরূপে সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া শ্বশুর বাটীতে ফিরিলেন এরং রাত্রে আহারান্তে নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ন করিয়া জামাই বাবু স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণলাল রায়ের বিবাহিতা কন্যার নাম কিরণবালা। কিরণের মাতা কিরণকে জামাতার গৃহে শয়ন করিতে যাইবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন; কিন্তু কিরণ জননীর বাক্যে কর্ণপাতও করিল না। পিতা অনেক বলিলেন। জামাতা রাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন; কিরণ কিন্তু কিছুতেই স্বামিসকাশে গমন করিতে চাহিল না। জনক জননী অনেক বুঝাইবার পর নিরস্ত হইলেন। জননী জামাতার নিকট কন্যার ধৃষ্টতার জন্য কন্যার অনেক নিন্দাবাদ করিয়া জামাতাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক আপন স্থানে শয়ন করিতে গেলেন। কিরণও মাতার নিকট শুইল। যামিনী দ্বিপ্রহর, প্রকৃতিদেবী নিস্তব্ধ, জীবকুল নিস্তব্ধ; বৃক্ষের পত্রটী পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ, যেন পবনদেব প্রকৃতির গাত্রে বহুক্ষণ ব্যজন করিয়া ক্লান্তিবশতঃ কোথায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে বন্য পশুর চীৎকার ভিন্ন রাইপুর গ্রামে সকলি নিস্তব্ধ। এমন সময়ে কিরণবালা শয়নগৃহের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সদর দরজা খুলিয়া সদর রাস্তায় আসিল; এবং নির্ভয়ে একাকিনী গ্রাম্যপথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কুলকামিনী কিয়ৎদূর আগমন করিয়া গ্রামের একটী বৃহৎ পুষ্করিণীর ধার দিয়া সুরেশচন্দ্র দত্তের বাটীতে আসিল; এবং সুরেশের বৈঠকখানা

ঘরের দ্বারে আঘাত করিল। ঘরে এখন পর্য্যন্ত আলো জ্বলিতে-ছিল। দ্বারে আঘাত হইবামাত্র সুরেশচন্দ্র দ্বার খুলিয়া দিল। কিরণবালা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারবন্ধ করিল। সুরেশের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর। সুরেশ দেখিতে সুন্দর। সুরেশচন্দ্র সদানন্দের ভাগিনেয়। সুরেশের পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তিনি সুরেশকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। সুরেশ কিছুদিন বেশ লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। পরে সঙ্গদোষে মদ্যপান করিতে শিখিল। লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রদোষ জুটিল। দিবারাত্রি মদ চলিতে লাগিল। সুরেশের পিতা পুত্রের কুচরিত্রে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাকে অধিক দিন বাঁচিতে হয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর সুরেশ পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল। অবাধে মদ চলিতে লাগিল। পৈতৃক বিষয় এক একটী করিয়া প্রথমে বন্ধক পড়িল। পরে নীলাম হইতে লাগিল। শেষে ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িল। তথাপি মদের ঘোর কমিল না। কিরণবালা কুলীনকন্যা; পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কিরণের বিবাহ হয় নাই। পাত্র জোটে নাই। কুমারী অবস্থায় সুরেশের সহিত কিরণের অবৈধ প্রণয় সঞ্চার হয়; এবং বিবাহের পূর্ব্বেই সতীত্বে জলাঞ্জলি দেয়। প্রথম প্রথম পরস্পর মধ্যে বিশেষ ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল; তাহা অদ্য সাত আট বৎসরের কথা। সুরেশের মনে কিরণবালার উপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। অদ্য সুরেশ সন্ধ্যা হইতে মদ খাইতেছিল। কিন্তু সুরেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ মদে নেশা হইতেছিল না। প্রাণ বড়ই চটিয়া যাইয়াছিল। এমন সময় কিরণবালা আসিল।

সুরেশের বড় ভাল লাগিল না। ইদানীং সুরেশ কিরণবালাকে দেখিতে পারিত না। কিন্তু পাপীয়সী সুরেশকে ছাড়িতে পারিত না। সুরেশ কিরণবালা আসিলে তাহাকে যেন দেখিয়াও দেখিল না। মদ খাইতে লাগিল। কিরণ সুরেশের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াও সুরেশের নিকট গিয়া বসিল ও স্বামীর আগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিল। সুরেশ তাহাতে কোন কথা কহিল না। কিরণবালা সুরেশের কঠিন ব্যবহারে বড় ক্ষুণ্ণা হইল এবং সুরেশকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সুরেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কিরণকে বলিল, "কিরণ, তুমি আমাকে ছাড়, আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ গোপনে পাপকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছি। ভবিষ্যতে সমস্ত প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। প্রকাশ হইলে যে বিপদ হইবে, তাহা তুমি বেশ বুঝিতেছ। কিরণ কাতরস্বরে কহিল, "সুরেশ, আমি মরিব। তবু তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। তুমি দিন দিন আমার উপর এমন কঠিন হইতেছ কেন? আমার রূপ নাই সত্য; কিন্তু আমার ভালবাসা আছে। আমি আমার প্রাণের সব ভালবাসা তোমাতে অর্পণ করিয়াছি! আমি তোমা ছাড়া অন্যকে কেমন করিয়া ভাল বাসিব। আমার হৃদয় অপরের নিকট মরুর ন্যায় শুষ্ক। আমি তোমাকে ছাড়িয়া কি লইয়া সংসারে থাকিব? আমি ত আর কাহাকে ভাল বাসিতে পারিব না। আমাকে রাখিতে হয় রাখ, মারিতে হয় মার। আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকন্যা সুরেশের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। ধন্য কন্দর্প! অদ্য তোমার প্রভাবে ব্রাহ্মণতনয়া সুরেশের পদতলে অবলুণ্ঠিতা! ধন্য তোমার মহিমা! এ দৃশ্য কেবল তোমার মহিমাতেই সম্ভবে! সুরেশ

হাসিল এবং নির্দ্দয়ভাবে বলিতে লাগিল। পাপী সুরেশ কিরণকে তাড়াইবার জন্য সাধুতার ভান করিয়া বলিতে লাগিল, "কিরণ, তুমি কি অধিক আশা করিতে পার? আমাদের ভালবাসা কি চিরস্থায়ী হইতে পারে? মনুষ্য-হৃদয়ে এ প্রকার ভালবাসা এ অপেক্ষা অধিক দিন স্থান পাইতে পারে না। কখন পায়ও নাই। পাপ যে ভালবাসার মূল, বিপদ্ যাহার অঙ্গ, সে ভালবাসা কখনও দৃঢ়মূল হইতে পারে না। যখন এই ভালবাসার মধ্যে নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতা জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে; তখন এ ভালবাসা অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না। বাড়িতে দেওয়াও উচিত নয়।" কিরণ সুরেশের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "সুরেশ, তুমি কতদূর পাপী—আমাকে তুমি বিনা অপরাধে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ!"

সুরেশ বলিল, "কিরণ, একদিন আমি তোমাকে ভাল বাসিয়াছিলাম, হৃদয়ে পূজা করিয়াছিলাম; সে অনেক দিনের কথা; পরে তোমার বিবাহ হইল, তুমি অপরের বিবাহিতা পত্নী হইলে—তথাপি পাপকর্ম্মে তোমার নিবৃত্তি হইল না! তুমি এক্ষণে অপরের পরিণীতা পত্নী, দুশ্চারিণী, পাপীয়সী পত্নী। আমরা দুই জনেই পাপী; কিন্তু তুমি আমা অপেক্ষা শত গুণ সহস্র গুণ অধিক পাপী। তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে পবিত্র পরিণয়-বন্ধন ছিন্ন করিতেছ। বিবাহের পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছ না। অদ্য তুমি স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আসিয়াছ। আজ স্বামীকে ত্যাগ করিলে, কাল আমাকে করিবে। আজ স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনী হইলে, কাল আমার হইবে। আমাকে বিষ খাওয়াইবে। দুশ্চারিণীকে বিশ্বাস

কি ?" সুরেশের মাথা গরম হইয়াছে—সে অনর্গল বকিতে লাগিল ; ও কিরণকে গালি দিতে লাগিল। পরে কিরণ তাহাতেও ঘর হইতে চলিয়া গেল না দেখিয়া, সুরেশ সে ঘর হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল। কিরণ কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া সুরেশের নিকট আসিল। তখন রাগে অভিমানে, তাহার শরীর জ্বলিতেছিল। কিরণ বলিল, "সুরেশ, তুমি আমাকে কি দোষে ত্যাগ করিতেছ ?" সুরেশ বলিল, "দোষের কথা আবার মুখ দিয়া বাহির করিতেছ ? তুমি অনন্ত দোষে দূষিত। নতুবা সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেবে কেন ? তবে তুমি আমার নিকট কোন দোষ কর নাই। করিবে, সেই আশঙ্কায় ত্যাগ করিতেছি। আমাদের ভালবাসা পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য, ধর্ম্মবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য নহে। সেই পাপবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে। স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে আমাকে ছাড় ; তোমার এখনও সৌন্দর্য্য আছে। এখনও সেই হাসিমাখা মুখ আছে। কিন্তু তোমার সে বালিকাহৃদয় নাই। সেই হৃদয় এখন পাপে কলুষিত হইয়াছে। ভালবাসা পাপ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। মরুভূমিতে কুসুম ফুটে না। তুমি আপনার পথ দেখ, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া সুরেশ পুনর্ব্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মনুষ্যহৃদয় মরুভূমি বিশেষ—দয়া, মায়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বাৎসল্য প্রভৃতি যাহা সে হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়, তাহা মরীচিকা মাত্র—দেখিতে হৃদয়ানন্দদায়িনী। মনুষ্যহৃদয় সময়ে বজ্রাপেক্ষা কঠিন ; সময়ে মৃণাল অপেক্ষা কোমল। এরূপ বিষমধর্ম্মশীল বস্তুর উপর মানব জীবনের সুখাসুখ নির্ভর করে ; তাহাতে যে বিষময় ফলোৎপত্তি হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ? কিরণ

সুরেশের ব্যবহারে বিশেষ ব্যথিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে কি ভাবিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে আপনার বাটীতে আসিল এবং স্বামী যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল, সেই গৃহের দ্বারে আঘাত করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বারে আঘাতের শব্দে শশিশেখরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখনও ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। শশিশেখর তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। কিরণ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্বামীকে বলিল, "আমাকে চেন? তাই যদি চিনিবে, তবে আমার এ দশা কেন হইবে? আমি তোমার স্ত্রী, নাম কিরণ—বিবাহের পর আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। আজ সাত বৎসর পর আসিয়াছ। আমি প্রথমে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই, তাহার কারণ ছিল; সেই কারণ বলিতে আসিয়াছি। তুমি আমার একটী কথা রাখিবে?"

কিরণ এক নিশ্বাসে এত কথা বলিয়া ফেলিল—শশী কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে অবাক্ হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিরণবালার আকৃতি তখন বিশেষ ভীতিব্যঞ্জক। নেত্রদ্বয় আরক্ত, অধর, ওষ্ঠ তখনও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল। কিরণ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "পারিবে"?

শশী। কথাটা কি?

কিরণ। একজনকে খুন করিতে পারিবে?

শশী চমকিয়া উঠিল; বলিল, "সে কি—খুন! আমার দ্বারা হইবে না।" পাপীয়সী কিরণবালা খুনকার্য্য বড়ই সহজ মনে করিতেছিল। শশিশেখরের কথা শুনিয়া বলিল, "কাপুরুষ, যদি কেহ তোমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিতে চাহে, তাহাকে তুমি খুন করিতে পারিবে কি না?"

স্ত্রীর সতীত্বনাশের কথা শশিশেখরের কাছে বড় নূতন নহে; তবে সে পরকে খুন করিয়া নিজে মরিবে কেন?

কিরণ বলিল, "তোমার জন্মে ধিক্, কাপুরুষ, তোমার কর্ম্মে ধিক্। তোমার মরণই মঙ্গল, আমি চলিলাম"—শশী দেখিল, কিরণ যায়, হয়ত আর দেখা হইবে না; এই সময় কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করিয়া নবগুণসম্পন্ন মহারথী কুলীনতনয় স্ত্রীকে পথখরচ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "তুমি চলিলে, থাকে ত আমায় কিছু পথখরচ দিয়া যাও—আমি কাল সকালেই চলিয়া যাইব।" কিরণ রাগে ঘৃণায় একটী বাক্স খুলিয়া শশীর হাতে দশ টাকার একখানি নোট দিল; দিয়া বলিল, "এই দশটাকা দিলাম, পথখরচ কোরো। আর তোমার মরণ যেন শীঘ্র হয়। তোমার শ্রাদ্ধে আমি অনেক খরচ করিব।" এই বলিয়া কিরণ স্বামিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে রাত্রে কিরণ বা শশী কাহারও নিদ্রা হইল না। শশীর মনে আনন্দ ধরিতেছিল না। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাটী হইতে শশী অনেক গুলি টাকা পূর্ব্বেই আদায় করিয়াছিল; এক্ষণে স্ত্রীর নিকট হইতে আবার দশ টাকা পাইয়া শশীর মনে আনন্দ

উথলিয়া পড়িতেছিল। কিরণের কথা তাঁহার মনে স্থানও পাইল না। কিরণের মন প্রতিহিংসা রাক্ষসী অধিকার করিয়াছিল। কিরূপে সুরেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে এই ভাবনায় কিরণ ক্ষণমাত্র চক্ষু বুজিতে পারিল না!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তৎপর দিন সুরেশচন্দ্র আপন বাটী ত্যাগ করিয়া ভগিনীর বাটী শ্যামনগরে চলিয়া যায়। সুরেশকে নিজ বাটীতে না দেখিতে পাইয়া উত্তমর্ণগণ একে একে সুরেশের নামে নালিশ করিল। সুরেশের ভদ্রাসন বাটী বিক্রয় হইয়া গেল। সুরেশ আর গ্রামে ফিরিল না। ভগিনীপতির বাটীতে সুরেশকে অগত্যা বাস করিতে বাধ্য হইতে হইল। সেই সময়ে সুরেশের চরিত্র সংশোধনের জন্য সুরেশের ভগিনীপতি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। সুরেশের মদ না হইলে এক দণ্ডও চলে না, মদ না পাইলে সুরেশের কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। সহোদরা সে কষ্ট দেখিতে পারে না। সহোদরা স্বামীর অজ্ঞাতসারে সুরেশকে মদের খরচ দিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপ ভাবে কতদিন চলিতে পারে? একদিন সুরেশের ভগিনীপতি সুরেশকে বাটী হইতে অন্যত্র যাইতে বলিলেন। সুরেশ অগত্যা ভগিনীর বাটী ত্যাগ করিয়া মাতুল সদানন্দের বাটীতে আগমন করিতে বাধ্য হইল। সদানন্দ সুরেশের চরিত্রদোষ সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিয়াছিল।

এক্ষণে সুরেশের আগমনে সদানন্দ বিরক্ত হইল। সে সুকুমারীকে সুরেশের আগমনবার্ত্তা জানাইল ও তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানাইয়া তাহাকে বাটীতে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। সুকুমারী, "সুরেশ নিরাশ্রয়, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক" ইত্যাদি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সুরেশকে বাটীতে রাখিবার জন্য সদানন্দকে অনুরোধ করিল। সদানন্দ অন্যমত হইতে পারিল না, সুরেশ সদানন্দের বাটীতে বাস করিতে লাগিল। সুকুমারীর স্বামী সদানন্দের বাটী হইতে চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে সুরেশ সদানন্দের বাটীতে আইসে। সদানন্দের অন্য কোন নিকট উত্তরাধিকারী না থাকায় সুরেশই সদানন্দের সমস্ত বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সে সদানন্দের বাটীতে থাকিতে থাকিতে দেখিল যে, সদানন্দ সুকুমারীর বড় বাধ্য। তাহার পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজই করে না। ফলতঃ সুকুমারীই সকল বিষয়ের কর্ত্রী। সুরেশ সুকুমারীর কর্ত্তৃত্বাধীন্যে থাকিতে বড় নারাজ। কিন্তু না হইলে চলে না। সদানন্দের বাটীতেও সুরেশের মদ্যপান চলিতেছিল। খরচ কোথা হইতে পায়, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। সুরেশের ইচ্ছা সুকুমারী সদানন্দকে বলিয়া কহিয়া সুরেশকে কিছু কিছু হাতখরচ স্বরূপ দেওয়ায়; কিন্তু তাহা না পাওয়ায় সুকুমারীর উপর সুরেশের বড় রাগ। অথচ চলিয়া যাইবার কোন স্থান নাই। কাজেই সুরেশের মনের রাগ মনেই থাকিয়া যায়। কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকিবার পর সুরেশ শুনিল যে, সদানন্দ তাহার সমস্ত সম্পত্তি সুকুমারীকে দান করিবে। সদানন্দ একমাত্র উত্তরাধিকারী সুরেশের দুশ্চরিত্রে বড়ই ক্ষুব্ধ; এবং সে বিষয়ের

উত্তরাধিকারী হইলে, বিষয় আশয় দুইদিনও রাখিতে পারিবে না, উড়াইয়া দিবে; এই ভাবিয়া সুকুমারীকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিবে এইরূপ স্থির করে। সুরেশ মহা বেগতিক দেখিল। আপন হস্ত হইতে এই অতুল সম্পত্তি বাহির হইয়া যাইতেছে, ইহার অন্য কোন উপায় নাই; এই ভাবিয়া সুরেশ মনে মনে বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। সুকুমারীর উপর তাহার রাগের আর সীমা রহিল না। একদিন রাত্রে সুরেশ মদ্যপান করিতে করিতে মনে মনে ঐ সমস্ত বিষয় আন্দোলন করিতেছিল। "এত বড় বিষয় হাত হইতে বাহির হইয়া যাইবে! সুকুমারী এই অতুল-সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে! আর আমি একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইব!" সুরেশ এইরূপ ভাবিতেছিল। "যেরূপেই হউক, সুকুমারীর হস্তে যাহাতে বিষয় না যায়, তাহা করিতে হইবে। যতদূর মহাপাপ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, সুকুমারীকে বিষয় লইতে দেওয়া হইবে না," পাপিষ্ঠ মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছিল ও মদ খাইতেছিল। কিরূপে সঙ্কল্প সাধন হইতে পারে, তাহার উপায় ভাবিতে ভাবিতে সুরেশের মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। মদের নেশা চটিয়া গেল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। রায়পুর গ্রাম নিদ্রার কোমলক্রোড়ে শান্তিসুখ অনুভব করিতেছে; কিন্তু পাপিষ্ঠের চক্ষে ঘুম নাই। সুরেশের মনের অস্থিরতা বড়ই প্রবল। কি করিয়া বিষয় রক্ষা করা যায়। কি করিয়া সুকুমারীর আধিপত্য দূর করিতে পারা যায়। সুরেশের এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি প্রভাত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশের ভগিনীপতির নাম কেশবচন্দ্র। কলিকাতার একটী গভর্ণমেণ্ট আফিসে ভাল চাকরী করেন। দশটাকার সংস্থানও আছে। কেশবচন্দ্র লোকটী নিরীহ। কিছু কৃপণ—তাহাতে কাহার কি যায় আসে? কৃপণ হইলে জাত যায় না; যাহা হউক, কেশবচন্দ্র লোকটী ভাল। সকলের নিকট প্রতিপত্তি আছে। হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে কেশবচন্দ্র সদানন্দের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সদানন্দ কেশবচন্দ্রের মামাশ্বশুর। সদানন্দের বাটীতে তাঁহার এই প্রথম আগমন। সদানন্দ কুটুম্বগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখে নাই। কাজেই সদানন্দ কেশবচন্দ্রকে চিনিতে পারিল না। পরে পরিচয় পাইয়া যত্নপূর্ব্বক কেশবচন্দ্রকে বসাইল ও তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কেশবচন্দ্র যখন আসেন, তখন সুরেশ বাটীতে ছিল না। কেশবচন্দ্র ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সদানন্দকে বলিলেন যে, "সুরেশ যখন আমার বাটীতে থাকিত, তখন বাটীর সর্ব্বত্রই সুরেশের গতিবিধি ছিল। আমার স্ত্রীর বাক্সে একখানি একশত টাকার নোট ছিল। সুরেশ আমার বাটী ত্যাগ করিবার দিনকয় পরে কোন কারণ বশতঃ ঐ নোট খানি ভাঙ্গাইবার আবশ্যক হয়। আমার স্ত্রী নোটখানি বাক্সে না দেখিতে পাইয়া আমি নোটখানি রাখিয়াছি, ভাবিয়া নোটখানি আমার নিকট আছে বলে। আমি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবার পর নোট খোয়া গিয়াছে ভাবিয়া পুলিশে সংবাদ দিই।

নোট কে লইয়াছে প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। সুরেশের উপর সন্দেহ হয় মাত্র। কিন্তু আমার স্ত্রী তাহাতে রাগ করায় আমি সে সন্দেহ মনে স্থান দিই নাই। নোটের অনুসন্ধানে ছিলাম। নোটের নম্বর পুলিশে দিয়াছিলাম ও করেন্সী অফিসে নোট চুরীর বিষয় সমস্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। এক্ষণে দুই তিন দিন হইল, পুলিশ একটী লোককে ধরিয়া লইয়া আমার বাটীতে আসে। সে লোকটী বলিতেছে যে, সুরেশ তাহাকে নোটখানি ভাঙ্গাইতে দেয়। সুরেশকে নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা দিয়াছে, এবং কিছু টাকা সে নিজে লইয়াছে। তাহার অন্য প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় পুলিশ দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এখানে আসিবে।" সমস্ত শুনিয়া সদানন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। বাড়ীতে পুলিশ আসিবে এ অপেক্ষা ভদ্রলোকের ভয়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? সদানন্দ ভাগিনেয়কে অভিসম্পাত করিতে করিতে সুকুমারীর নিকট গমন করিল ও তাহাকে সমস্ত কথা জানাইয়া কহিল যে, "সুরেশের আর রক্ষা নাই। এবার সুরেশকে সত্যই জেলে যাইতে হইবে সেই সঙ্গে আমারও হাড় জুড়াইবে।" সুকুমারীর মাতা সুরেশের জেল হইবে শুনিয়া মনে মনে বড় খুসী হইলেন; কেন না, সুরেশ জেলে যাইলে সদানন্দের সমস্ত বিষয় সুকুমারীর পাইবার আর কোন বাধা থাকিবে না। সুকুমারীর সুখের পথের কণ্টক দূর হইবে। দানপত্র করিয়া দিতে সদানন্দের আর কোন আপত্তি থাকিবে না। এই মনে করিয়া সুকুমারীর মাতা বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন; ও পুলিশ আসিয়া সুরেশকে বাঁধিয়াছে কি না, তাহাই বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সরলা সুকুমারী সুরেশের বিপদে নিজের বিপদ্ জ্ঞান করিল; এবং যাহাতে সুরেশের কোন বিপদ্ না ঘটে—সেই জন্য সদানন্দকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিল। সুকুমারীর কথা সদানন্দকে শুনিতে হইল; এবং অতিশয় অনিচ্ছার সহিত সুরেশকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহা করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সুকুমারী পুলিশ আসিয়াছে কি না, সুরেশকে ছাড়িয়া দিয়া পুলিশ চলিয়া গিয়াছে কি না, এই বিষয়ের বার বার সংবাদ লইতে লাগিল। সদানন্দ সুকুমারীর অভিপ্রায় কেশবচন্দ্রকে জানাইল। কেশবচন্দ্র সুকুমারীর সদ্গুণের কথা লোকমুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে সুকুমারীর মনের ভাব অবগত হইয়া তাহার দয়া ও সরলতায় মুগ্ধ হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দুই তিন ঘণ্টা বাদে পুলিশ আসিল, ও সুরেশকে ধরিয়া সুরেশের হাতে হাতকড়ি দিল। সুরেশ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। সুকুমারী এই কথা শুনিয়া নিজেও কাঁদিল। পরের দুঃখে সুকুমারীর কোমল প্রাণ সদাই কাঁদে, আজিও কাঁদিল। এ পাপ সংসারে পরের জন্য কয়জন কাঁদিয়া থাকে? যে কাঁদে সে কি মনুষ্য? সেই দেবতা—সেই দেবতার চরণে আমাদের কোটী কোটী নমস্কার। তাঁহারই জন্ম সার্থক। আমরা যে দিন সকলে পরের দুঃখে কাঁদিতে শিখিব, সেদিন আর কেহ সংসার ছাড়িয়া স্বর্গকামনা করিবে না। সুকুমারী কাঁদিল ও সদানন্দকে ডাকিয়া বলিল, এখনি সুরেশকে খালাস করিয়া দিতে হইবে। সুকুমারী সদানন্দকে বলিল, "সুরেশের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন এমন কেহই নাই যে সুরেশের বিপদে বিপদ্ জ্ঞান করে। সুরেশ নিতান্ত নিরাশ্রয়; তুমি যখন তাহাকে আশ্রয় দিয়াছ, তখন তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা তোমার কর্ত্তব্য। সুরেশ না বুঝিয়া যদি একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করা তোমাদের উচিত হয় না। তুমি সুরেশের মাতুল, কেশবচন্দ্র ভগিনীপতি। সুরেশের পৃথিবীতে তোমরা ভিন্ন অন্য আত্মীয় কেহ নাই। এক্ষণে তোমারা দুইজনে মিলিয়া সুরেশকে জেলে পাঠাইলে লোকে বলিবে কি?" সদানন্দ সুকুমারীর কথা আর উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে বাহিরে গিয়া কেশবচন্দ্রকে

নিজ হইতে একশত টাকা দিল ও পুলিশকে রীতিমত সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিল। সুরেশ জানিল যে, সে সুকুমারীর জন্যই এই বিপদ্‌ হইতে অব্যাহতি পাইল। কেশবচন্দ্র সুরেশের অব্যাহতি ও তৎসঙ্গে নষ্টধন প্রাপ্তির জন্য আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু তদপেক্ষা সদানন্দকে এইরূপে সুকুমারীর আদেশ প্রতিপালন করিতে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন; এবং সুকুমারীকে শাপ-ভ্রষ্টা দেবকন্যা বলিয়া মনে করিলেন। কেশবচন্দ্র ভাবিলেন মনুষ্যের কি সাধ্য যে, কৃপণের অগ্রগণ্য নির্দ্দয়-হৃদয় সদানন্দের মতিগতি এরূপ পরিবর্ত্তন করাইতে পারে? যে সদানন্দ নিজের পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে বা অন্য কোন সৎকার্য্যে কখনও এক কপর্দ্দকও ব্যয় করে নাই; এক্ষণে একটী বালিকার কথামত সেই সদানন্দ সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহে। একি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয়? ঘোর বিষয়ী সদানন্দ যেন কোন মহামন্ত্রবলে এক সামান্যা বালিকার ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়াছে। দেবতা ভিন্ন এরূপ শক্তি মানুষে সম্ভবে না। কেশবচন্দ্র এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই রাত্রি সদানন্দের বাটীতে অতিবাহিত করিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে পরদিন প্রত্যুষে নিজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাটী গিয়া আপন স্ত্রীকে সুকুমারী ও সদানন্দের সদয় ব্যবহারের কথা জানাইলেন। কেশবচন্দ্রের স্ত্রী সুকুমারীকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্রও তাঁহাকে শীঘ্রই সুকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। কেশব-চন্দ্রের স্ত্রী জামাতা-বিভ্রাট-জনিত সুকুমারীর অপযশের কথা শুনিয়াছিলেন। আজ বলিলেন, সুকুমারীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহারা অপযশ ঘোষণা করিয়াছে, তাহাদের নরকেও স্থান হইবে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে কৃতান্তসদৃশ পুলিশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুরেশ একদিন আপনার অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিল। সেই ভাবনা কিন্তু সুরেশের বড় ভাল লাগিতেছিল না; বরং তাহাতে তাহার হৃদয় কাঁপিতেছিল। ভবিষ্যতে সুরেশের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, সুরেশ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সুরেশ যত ভাবিতে লাগিল, ততই নানারূপ বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। অতীতের সুখ, পিতার অবস্থা, মানসম্ভ্রম, বাল্যজীবনের নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ, বিদ্যালয়ে সমপাঠিগণের অকৃত্রিম প্রণয়, প্রভৃতি সমস্ত বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইয়া সুরেশের হৃদয়ে বড়ই যাতনা দিতে লাগিল। আবার সম্মুখে অন্ধতমসাবৃত ভবিষ্যৎ; তন্মধ্যে যতদূর অস্পষ্ট দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায় তাহাতে জঘন্য ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ অথবা অন্নবিনা অকালমৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই নাই। সুরেশের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আর সে ভাবিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের বন্ধন যেন শিথিল হইয়া যাইল। মাথা ঘুরিয়া গেল। সুরেশ কঠিন মৃত্তিকাশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিল। কেন সে মদ খাইতে শিখিল? কেন সে চুরী করিল? প্রবল অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দিনকয়েক সুরেশ মদ খাইল না। তাহার মনে যেন কি একটা আতঙ্ক হইয়াছিল। সে কখন কখন স্বপ্নেও দেখিত, যেন সে কারাগারে রহিয়াছে; কারারক্ষকগণ তাহার উপর বড়ই অত্যাচার

করিতেছে; চীৎকার শব্দে শয্যায় উঠিয়া বসিত। সুরেশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে তাহার স্বভাব সংশোধন করিবে। সে লেখাপড়া কতক জানে; কোন কাজকর্ম্ম করিয়া নিজের পেট চালাইতে পারিবে। পরের গলগ্রহ হইতে হইবে না। এইরূপে আট দশ দিন কাটিয়া গেল। সুরেশ বাটীর বাহির হয় না; বিশেষ কষ্ট হইলেও মদ খায় না। সদানন্দ ও সুকুমারীর আহ্লাদের সীমা নাই। সুরেশের চরিত্র সংশোধন হইলেই সুরেশের বিবাহ দিতে হইবে, সুকুমারীর হৃদয়ে এই অভিলাষ। সুরেশ একদিন মনে করিল, মদ ত আর খাইব না; পাড়ায় একটু বেড়াইতে দোষ কি? এই ভাবিয়া পাড়ার সমবয়স্কগণের সহিত তাস খেলিতে গেল। সেই দিন তাস খেলিতে খেলিতে অনেক রাত্রি হইল। বাজি রাখিয়া তাসখেলা হইতেছিল। সুরেশ তাসে জিতিয়া কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ-পূর্ব্বক বাটীতে ফিরিল। মধ্যে একপসলা বৃষ্টি হইয়াছিল। রাস্তায় কাদা। সুরেশ অন্ধকারে ধীরে ধীরে মাতুলালয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিল। রাস্তার ধারে একখানি মদের দোকান ছিল। সেই দোকানের সম্মুখ দিয়া সুরেশকে মাতুলালয়ে আসিতে হয়। এমন সময় আবার বৃষ্টি আসিল। অন্য কোন আশ্রয় না থাকায় সুরেশ বিশেষ অনিচ্ছার সহিত মদের দোকানে গিয়া দাঁড়াইল। দোকানের কর্ত্তার সহিত সুরেশের বিশেষ আলাপ ছিল। দিনকয় সুরেশ দোকানে আসে নাই, ইহাতে দোকানের কর্ত্তার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। সেদিন সুরেশকে দেখিয়া দোকানদার বড় খাতির করিল। সুরেশ এতদিন কোথা হইতে মদ আনিতেছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিল, ও তাহার দোকান ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া দুঃখ

প্রকাশ করিতে লাগিল। সুরেশ বলিল, "আমি মদ ত্যাগ করিয়াছি। আমি আর মদ খাইব না।" দোকানদার সুরেশের মত অনেককে "আর মদ খাইবে না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে শুনিয়াছে, ও পরদিন যথাসময়ে দোকানে হাজির হইতে দেখিয়াছে। সে সুরেশের কথায় হাসিতে লাগিল ও একগ্লাস মদ লইয়া সুরেশকে খাইতে অনুরোধ করিল। সুরেশ একজন ভাল খরিদ্দার। এমন খরিদ্দার প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ ছাড়িলে চলিবে কেন? সুরেশ গ্লাসটী প্রথমে হাত দিয়া সরাইয়া দিল। তখনও বৃষ্টি জোরে পড়িতেছে। দোকানদার সুরেশকে একগ্লাস ভিন্ন আর খাইতে অনুরোধ করিবে না। একগ্লাস খাইতে দোষ কি? আজ বৃষ্টি হইতেছে। জলকাদা ভাঙ্গিয়া বাটী যাইতে হইবে। অসুখ হইতে পারে, কাল হইতে আর না খাইলেই চলিবে। মধ্যে মধ্যে এক আধ দিন খাইলে কোন দোষ নাই। প্রত্যহ খাওয়াই দোষ। অধিক পরিমাণে খাইলেই লোক মানুষের বাহির হইয়া যায়। ওজন বুঝিয়া খাইলে মদে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। ইত্যাদি অকাট্য যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারা সুরেশের মন নরম করিতে লাগিল। সুরেশ প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; পরে বলিল, সে একগ্লাস ভিন্ন আর খাইবে না; এই বলিয়া সেই গ্লাসটী গলাধঃকরণ করিল। সুরেশচন্দ্র অনেক দিন বাদে মদ খাইয়াছেন, অল্প হইলেও একটু নেশা হইল। দোকানদার সুবিধা বুঝিয়া আর একগ্লাস সম্মুখে ধরিল। না না করিতে করিতে সুরেশচন্দ্র সে গ্লাসটীও শেষ করিল; পরে নেশা জমিয়া আসিল। ঘন ঘন গ্লাস চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ বোতল শেষ হইয়া গেল। সুরেশ তাসের জিতের টাকা

হইতে সমস্ত বোতলের দাম দিয়া পানাবশিষ্ট মদ সমেত বোতলটী লইয়া মাতুলালয়াভিমুখে চলিল। রাত্রি ঢের হওয়ায় সদর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুরেশের বিলক্ষণ নেশাও হইয়াছিল। সে টলিতে টলিতে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরের বারাণ্ডায় মদের বোতলটী রাখিয়া সেই খানেই শুইয়া পড়িল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে সুকুমারী তুলসী ও লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিতে আসিয়া সম্মুখে সুরেশকে তদবস্থায় দেখিয়া অবাঙ্মুখী হইয়া রহিল। তাহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, সুরেশের চরিত্র শুধরাইয়াছে। তাহার বিবাহ দিবে। সুরেশ দশজনের একজন হইবে। সুকুমারীর মনে বড়ই আশা হইয়াছিল। আজ সে আশা ভরসায় জনমের মত সুকুমারীকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। সদানন্দকে পরক্ষণেই সমস্ত বলিল। সে মন্দির সমীপে আসিয়া দেখিল যে, মদের বোতল হইতে মদ পড়িয়া লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরে সৌরভ বিস্তার করিতেছে। তৎসঙ্গে সুরেশ বমি করিয়াছে। সুরেশের আলুথালু বেশ। সে মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছে। সদানন্দ সুরেশকে তখনি বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিল। সুকুমারী তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "যখন এক জনকে আশ্রয় দিয়াছ, তখন তাহাকে নিরাশ্রয়

করা উচিত হয় না। ও মদ খায় উহারই পরকাল নষ্ট হইবে অপরের কি? অধিকন্তু এখানে থাকিলে যদিও কখনও শুধরা ইতে পারে, অন্য স্থানে গেলে উহার শুধরাইবার কোন আশা থাকিবে না।" সদানন্দ অন্য কোন ওজর না করিয়া চাকরগণকে সুরেশকে লইয়া যাইতে অনুমতি করিল এবং মদের বোতল প্রভৃতি দূর করিয়া দিয়া সেই স্থান গঙ্গাজলে ধৌত করিতে বলিল। উক্ত কার্য্য শেষ হইলে সুকুমারী ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বামীর মতিগতি ফিরিবার জন্য বর মাগিল। পরে অবোধ সুরেশের যাহাতে সুমতি হয়, তাহার জন্য বরভিক্ষা করিল। পরে বাটীর সকলেরই মঙ্গল কামনা করিল। গ্রামের সকলে যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে সেই প্রার্থনা করিল। সদানন্দ সুরেশের চৈতন্য হইলে সুরেশকে অনেক বুঝাইল। পরে বলিল, তুমি নিজের দোষে এই সব বিষয়-সম্পত্তি হারাইলে। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিলে। আমি সমস্ত বিষয় সুকুমারীকে দিয়া কাশীধাম যাত্রা করিব, মনঃস্থ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, তোমায় কিছু দিয়া যাইব, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আর আমার সে ইচ্ছা নাই। আমি শুঁড়িকে বড় মানুষ করিবার জন্য তোমাকে বিষয় দিতে চাহি না। তুমি সুকুমারীর মন যোগাইয়া থাকিতে পার, এখানে থাকিবে, নতুবা তোমায় অন্যত্র যাইতে হইবে। কেবল সুকুমারীর অনুরোধে আমি তোমার মত মাতালকে বাড়ীতে রাখিতে সম্মত হইয়াছি, নতুবা তোমার মত কুচরিত্রের সংসর্গ ভদ্রলোকে করে না। সদানন্দের মিষ্টালাপে সুরেশ বড়ই সন্তুষ্ট হইল! সে একবার সদানন্দের প্রতি তীব্র নয়নে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। সদানন্দ ভাবিল, সুরেশ ভয় পাইয়া মদ ত্যাগ করিবে;

সুরেশ যে তখন কি ভাবিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানিতে পারিতেছিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত দিন সুরেশের মনটা বড়ই বিষণ্ণ রহিল। সন্ধ্যার পর হইতে আবার মদ চলিল। রাত্রি দশ এগারটা পর্য্যন্ত মদ চলিতে লাগিল। এই সময় একজন চাকর আহার করিবার জন্য সুরেশকে ডাকিতে আসিল। সুরেশ রাত্রে কিছু খাইবে না বলিয়া চাকরকে বিদায় করিয়া দিল। চাকর চলিয়া গেলে, সুরেশ ঘরের ভিতর কতক্ষণ পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরেশের মনোমধ্যে তখন কত ভাবেরই উদয় হইতেছিল। সুরেশ একবার ভাবিল যে, সে এবাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে; আবার ভাবিল, ত্যাগ করিয়া যায় কোথা? আবার ভাবিল যে, দুটা পেটের ভাতের জন্য তাহাকে এত কথা সহ্য করিতে হইল! মনে মনে করিল তা সে পারিবে না। আবার ভাবিল, সহ্য না করিয়া এখন করে কি? কোথায় যায়? কোথায় যাইলে আশ্রয় পাইতে পারে? সমস্ত সংসারের মধ্যে এমন স্থান নাই, যেখানে এক দিনের জন্য সুরেশ আশ্রয় পাইতে পারে। মন বড়ই চঞ্চল হইল, কি করিলে মাতুলের অধীনত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। সুকুমারীর আধিপত্যের মধ্যে থাকিতে হয় না। সুরেশ

তাই ভাবিতে লাগিল। সুকুমারী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। মামার এতটা বিষয়, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ফাঁক করিবার চেষ্টায় আছে। মামাকে যাদু করিয়াছে। সুরেশ এই সব ভাবিতে লাগিল। মনোমধ্যে একটা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "যাই হোক, মামার দুটা কথা সয়; কিন্তু সুকুমারীর আধিপত্য সয় না। সে মামাকে উঠিতে বলিলে মামা উঠে, বসিতে বলিলে মামা বসে; এ সহ্য হইবার নহে। সুকুমারী যেদিন বলিবে সুরেশকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেও, সেই দিনই ত আমাকে এ বাটী হইতে চলিয়া যাইতে হইবে; এ অপেক্ষা হীনতা মানুষের আর কি হইতে পারে? তবে কি করা যায়? এতবড় বিষয়টা—এত ধনসম্পত্তি—সত্য সত্যই কি সুকুমারী গ্রাস করিবে? সুকুমারী মামার কে? আমাকে বঞ্চিত করিয়া সুকুমারীকে মামা এই অতুল ধনসম্পত্তি দান করিবে? আর আমি একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইব? সুকুমারীর হাত তোলার মধ্যে আমাকে থাকিতে হইবে? এ অসহ্য! হইতেই দেওয়া হইবে না! সুকুমারীকে কখনই বিষয় পাইতে দেওয়া হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক, বন্ধ করিতে হইবে। মনে মনে সুরেশ এইরূপ সঙ্কল্প করিল। কিন্তু কি উপায়ে বন্ধ করা যাইতে পারে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। "মামাকে বলা আর না বলা, উভয়ই সমান, তবে কি করা যুক্তিসিদ্ধ?" সুরেশ আবার চিন্তামগ্ন হইল। এই সময় সদানন্দ মরিলে সুরেশের পক্ষে বড়ই ভাল হয়। কিন্তু সদানন্দ যে কিছু দিনের মধ্যে মরিবে, তাহার কোনরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না। সে কুড়ি বৎসরের মধ্যে মরিবে কি না

কে বলিতে পারে? সুকুমারীর মৃত্যু হইলেও সুরেশের পথের কণ্টক যায়। সুকুমারীর মৃত্যু হইলে সদানন্দ আর কি রাস্তার লোক ডাকিয়া বিষয় দিবে? তখন সমস্ত বিষয়ই সুরেশের পাইবার বাস্তবিকই বিশেষ সম্ভাবনা। তবে সুকুমারীই বা কিরূপে মরে? সুরেশের সুবিধার জন্য ত সুকুমারী তখনই মরিতে পারে না। তবে সুকুমারীকে ইহলোক হইতে কি প্রকারে অপসারিত করা যায়? সুরেশ তাহাই ভাবিতে লাগিল, ও বহুক্ষণ মনে মনে উক্ত বিষয় আন্দোলন করিয়া সেই গভীর রাত্রেই মাতুলের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া রাইপুরাভিমুখে যাত্রা করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশ রাইপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর, কিরণবালা সুরেশ কোথায় আছে, বা কি করিতেছে, তাহার কোন উদ্দেশই প্রাপ্ত হয় নাই। সুরেশের নির্দ্দয় ব্যবহারে সুরেশের উপর কিরণবালার যেটুকু রাগ হইয়াছিল, সুরেশের অদর্শনে সে রাগ কিরণবালার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। সে সুরেশকে দেখিবার ও পাইবার জন্য বড়ই অস্থির হইয়াছিল। কিন্তু সুরেশ কোথায় ? কোথায় যাইলে সুরেশকে পাইতে পারে, কিরণ তাহার কিছুই জানিত না। বড়ই ক্লেশে কিরণবালার দিনরাত্রি অতিবাহিত হইতেছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় কিরণ তাহাদের খিড়কীর বাগানের পুষ্করিণীতে একাকী গা ধুইতে গিয়াছিল। পুষ্করিণীটী কিরণদের বাটী হইতে কিছু তফাতে। বাগানটী আম, জাম, তাল, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষের ঘন বিন্যাসে অন্ধকারময়। কিরণ গা ধুইতেছিল, গা রগড়াইতেছিল; কিন্তু ভাবিতেছিল সুরেশকে। সুরেশের মুখখানি মনে পড়িতেছিল ও কিরণকে বড় যাতনা দিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ এক মনুষ্যমূর্ত্তি সেই পুষ্করিণী-ঘাটের উপর দেখা দিল; এবং "কিরণ" বলিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিল। কিরণ চাহিয়া দেখিল যে, সুরেশ। সে তখন দৌড়িয়া জল হইতে উঠিয়া আসিল এবং সুরেশের পদপ্রান্তে ছিন্নলতার ন্যায় লুটাইয়া পড়িল। পাপিষ্ঠ সুরেশ কিরণের অবস্থায় মনে মনে হাসিল; কিন্তু নিজের কার্য্যোদ্ধারের জন্য

কিরণকে মৌখিক কত ভালবাসার কথা বলিল; কত আদর করিল—কিরণকে আকাশের চাঁদ পর্য্যন্ত হাতে দিবে বলিয়া কিরণকে আশ্বাসিত করিতে লাগিল। কিরণ কতদিন সুরেশের ভালবাসা পায় নাই। কতদিন সুরেশ তাহাকে আদর করে নাই। সে আজ সুরেশের আদরে গলিয়া গেল। সে অতৃপ্ত নয়নে সুরেশকে দেখিতে লাগিল, কত মনের কথা বলিল, সুরেশের বিচ্ছেদে তাহার যে যাতনায় দিনরাত্রি যাইতেছে, তাহা জানাইল। সুরেশ এতদিন তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় ছিল; কেন দেখা দেয় নাই—সে অতি নিষ্ঠুর, পুরুষজাতি অতি নিষ্ঠুর এইরূপ কত অভিযোগ করিল। কিন্তু সুরেশের মন কিরণের ভালবাসায়—কিরণের ভালবাসা মিশ্রিত তিরস্কারে বড় একটা বিচলিত হইল না। সে পাষণ্ড, সে আপন সুখের পথের কণ্টক দূর করিবার সহজ উপায় অন্বেষণ করিতেছিল। সুকুমারীকে ইহলোক হইতে শীঘ্র শীঘ্র পরলোকে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এক্ষণে কিরণকে বলিল, "কিরণ, আমার রাইপুরের সম্পত্তি, ভদ্রাসন বাটী প্রভৃতি যাহা ছিল, সমস্তই আমার গিয়াছে, ঋণদায়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, তাহা তুমি জান? এখন আমি নিরাশ্রয়, নিরন্ন, অদ্য কি খাইব, কোথায় থাকিব, তাহার স্থিরতা নাই। আমার জীবন আমার বড়ই ভারবোধ হইয়াছে—এজীবনে আর কোন প্রয়োজন নাই—আমি মরিব—আর মরিব বলিয়াই তোমার সহিত শেষ দেখা করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া সুরেশ কিরণকে একটী বিষের কৌটা দেখাইল। সুরেশ সুকুমারীকে মারিবার জন্য এই কৌটা সংগ্রহ করিয়াছিল। এক্ষণে কিরণকে ভয় দেখাইবার জন্য নিজে মরিবে বলিতেছিল।

কিরণ, সুরেশ সত্য সত্যই মরিবে, ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "সুরেশ, তুমি আমাকে না মারিয়া মরিতে পারিবে না—বিষ দাও, আমি প্রথমে খাই—আমি মরিলে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিও।" এই বলিয়া বিশেষ কাতরস্বরে সুরেশের নিকট বিষভিক্ষা করিল। সুরেশের মরিবার অণুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না সে মরিবার ভয় দেখাইয়া কিরণকে আপন হস্তগত করিবার অধিকতর চেষ্টা করিতেছিল। কিরণ বলিল, "আমাকে বিষ দিলেনা। আমি জলে ডুবিয়া মরিব"; এই বলিয়া সে জলে ঝাঁপ দিবার জন্য যেমন উঠিয়া দাঁড়াইল, সুরেশ কিরণের হাত ধরিয়া বলিল, "কিরণ তুমি যে আমাকে আন্তরিক ভাল বাস, তাহা আমি জানি, এক্ষণে তুমি যদি আমাকে মরিতে না দাও, তবে আমার একটী কথা রাখিবে বল?" কিরণ যেন আকাশের চাঁদ সত্যই হাতে পাইল। বলিল, "রাখিব", "রাখিবে" "রাখিব", "রাখিবে" "রাখিব।" সুরেশ বলিল তিনসত্য করিলে, দেখিও, যেন পরে বলিও না "পারিব না।" কিরণ বলিল, "না, আমি তোমার কথা রাখিব; তোমার কথা রাখিতে যদি আমাকে মহাপাপে ডুবিতে হয় ডুবিব। তবু তোমায় মরিতে দিব না।" সুরেশ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "বলি শুন, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে—রায়পুর গ্রামে আমার মাতুল সদানন্দ দত্তের বাস। তাঁহার ধনসম্পত্তি প্রচুর। তাঁহার পুত্র কন্যা কেহ নাই। আমিই তাঁহার সেই বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তিনি তাঁহার সেই প্রচুর সম্পত্তি এক ব্রাহ্মণকন্যাকে দান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সেই ব্রাহ্মণকন্যা রায়পুর গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কন্যা, নাম সুকুমারী।" কিরণ বলিল, "হাঁ, বাবার মুখে এই

সুকুমারীর কথা শুনিয়াছিলাম। একদিন আমার স্বামী তাঁহার শ্বশুরবাড়ী মনে করিয়া সুকুমারীর পিতার বাটীতে যান। আমার স্বামী সেই রাত্রি সুকুমারীর সহিত কাটান। সেই লইয়া বিষম গোলযোগ হয়। আমার পিতা সেইদিন রায়পুরে ছিলেন। তিনি গোলযোগ দেখিতে গিয়া দেখেন, আমার স্বামীকে লইয়া গোল বাঁধিয়াছে। তখন বাবা আমার স্বামীকে লইয়া আমাদের বাটীতে আসেন ও এই সমস্ত কথা আমার মাতাকে বলেন। আমি সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার স্বামী যেদিন আমাদের বাটীতে আসেন, সেই দিনের কথা বেশ তোমার স্মরণ আছে। সেই দিন রাত্রে আমার তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়। তার পর আজ এই দেখা। সুরেশ তুমি কি নির্দ্দয়!" সুরেশ সব শুনিল এবং সুকুমারী দুশ্চরিত্রা ও সদানন্দের উপপত্নী, তাহা তাহার বিশ্বাস হইল। তখন সে বলিল, সুকুমারী যে দুশ্চরিত্রা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মাতুল মহাশয় তাহাকে উপপত্নী স্বরূপ রাখিয়াছেন; আর সেই জন্যই সুকুমারীর কথায় তিনি অত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন; এবং সুকুমারী মাতুলকে ফুসলাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। এক্ষণে সুকুমারী বাঁচিয়া থাকিলে আমি পথের ভিখারী, মরিলে আমি লক্ষপতি। তখন তুমি আমার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সুকুমারীকে মারিতে পারিলে আমার সুখের পথের কণ্টক দূর হয়। এক্ষণে তুমিই একমাত্র ভরসা স্থল। তুমি এই বিষয়ে সাহায্য না করিলে আমার দুর্দ্দশার একশেষ থাকিবে না। আমাকে অন্নাভাবে মরিতে হইবে; তার চেয়ে তোমার সম্মুখে এই বিষ খাইয়া মরা শতগুণে শ্রেয়ঃ।"

কিরণ বলিল, আমাকে কি করিতে হইবে?

সুরেশ। সুকুমারীকে বিষ খাওয়াইতে হইবে

কিরণের মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল, "আমি তা পারিব না।"

সুরেশ। তুমি না এই তিনসত্য করিলে, ভাল? আমিই মরিব, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। এই বলিয়া সুরেশ চলিয়া যাইতে চাহিল। তখন কিরণ কাতরস্বরে বলিল, "সুরেশ, তুমি এ প্রবৃত্তি ত্যাগ কর, আমি তোমাকে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব। আমাকে তুমি দেশান্তরে লইয়া চল, আমি দাসীবৃত্তি করিব, তাহাতে দুই জনের ভরণপোষণ চলিবে। তুমি এ অভিপ্রায় ত্যাগ কর। আমি পিতামাতা কাহাকেও চাহি না। আমি এ জীবন তোমার সেবাতেই শেষ করিব। আমার কথা রাখ।" সুরেশ বলিল, "আমি মাতুলের অত বিষয় ত্যাগ করিয়া ভিখারীর মত বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না। আমি চলিলাম। তুমি অল্পদিন মধ্যেই আমার মৃত্যুসংবাদ পাইবে।" এই বলিয়া সুরেশ চলিয়া যাইবার ভান করিল। সুরেশ সত্যসত্যই মরিবে ভাবিয়া কিরণ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "সুরেশ, তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? আমি তোমাকে যখন পাইয়াছি, তখন আর ছাড়িব না। আমি তোমার ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। আমি তোমাকে না দেখিতে পাইয়া অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি; আমি সে যন্ত্রণা আর সহ্য করিব না। সুকুমারীকে বিষ দিতে হয় দিব, নিজে মরিতে হয় মরিব, তোমাকে ছাড়িব না—দাও বিষের কৌটা দাও। আমাকে সঙ্গে করিয়া সুকুমারী যেখানে আছে সেই খানে লইয়া চল—আমি তাহাকে বিষ দিব—কিন্তু বল তুমি আমাকে আর ত্যাগ করিবে না?"

সুরেশ কিরণকে আবার কত আদর করিল। কিরণ গলিয়া গেল। সুরেশ তখন কিরণকে বলিল, "রাত্রি নয়টার সময় আমি তোমাদের বাটীর সম্মুখে রাস্তায় থাকিব। তুমি বাটী হইতে চলিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে রায়পুর যাইবে। সেখানে গিয়া মাতুলের অতিথিশালায় তোমাকে রাখিয়া দিব। কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি বলিবে তোমার বাটী অনেক দূরে। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, দুর্ভিক্ষের জন্য তোমার পিতামাতা তোমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অন্নাভাবে ভিক্ষা করিতে করিতে আমার মাতুলের অতিথিশালার নাম শুনিয়া সেই খানে উপস্থিত হইয়াছ তুমি ব্রাহ্মণকন্যা ভিক্ষা করিতেছ, এই কথা সুকুমারীর কানে উঠিলেই সে তোমাকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইবে। সুকুমারী তোমাকে বাটীতে থাকিতে বলিবে; তুমি তাহাতে সম্মত হইবে। পরে সুযোগক্রমে তাহার অন্নে বিষ দিবে তাহা হইলে সুকুমারী মরিবে; আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। পরে মাতুলের বিষয়ের অধিকারী হইলে তুমি আমার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া আমার সহিত সুখে বাস করিবে। তুমি আমার উপকার করিলে তোমাকে আমি প্রাণান্তেও ছাড়িব না। আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি বিবাহ করিব না। তুমিই আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া আমার গৃহে বাস করিবে।" কিরণ সুরেশের কথায় সম্মত হইল এবং রাত্রে তাহার সহিত দেখা করিবে প্রতিশ্রুত হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর হইতে সুকুমারীর লক্ষ্মী-জনার্দ্দন ও তুলসীর সেবা কিছু অধিক বাড়িয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার আরতি শেষ না হইলে সুকুমারী কিছুই আহার করে না। আরতি শেষ হইলে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের প্রসাদ আহার করে। আর শয্যায় শয়ন করে না। মৃত্তিকায় আঁচল পাতিয়া রাত্রি যাপন করে। মনে মনে করে, "আমার সুখের প্রত্যাশা কেন? স্ত্রীলোকের যাহাকে দেখিলে সুখ, যাহাকে খাওয়াইলে সুখ, যাহার সহিত কথা কহিলে সুখ, যাহার সেবায় পরম সুখ, সেই স্বামী হইতে আমি বঞ্চিত। আমার আবার খাওয়া কেন? আমার আবার শয়নে প্রয়োজন কি? ইহলোকে পতিই স্ত্রী-লোকের দেবতা। সেই দেবতাই যদি আমার বাম, তবে আমি কি সুখে এ দেহ সাজাইয়া চুল বাঁধিব, ভাল কাপড় পরিব, কাহার জন্য? মার ইচ্ছা আমি ভাল খাই, ভাল পরি, সদাই হাসিয়া বেড়াই, আমোদ করি, গহনা পরি, চুল বাঁধি, টিপ কাটি; কিন্তু কাহার জন্য? কুলীনের মেয়ের আবার সুখের আশা কেন? তাহার বাঁচাই বা কেন? তবে আত্মহত্যা মহা-পাপ—অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে, যেমন করিয়া আসিয়াছি তেমনি ফল ভোগ করিতে হইবে—তবে কি তিনি আর আসিবেন না? সবই আমার অদৃষ্টের দোষ, নতুবা এমন ভুল হইবে কেন? স্বামী যাহাই মনে করুন, লোকে যাহাই মনে করুক, আমি

আমার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছি। দেবতার কাছে আমি সতী— আমার তাই সুখ। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, স্বামী একদিন বুঝিবেন।" সুকুমারী মাঝে মাঝে এইরূপ ভাবে এবং ধৈর্য্য সহকারে মনের ভাব গোপন রাখিয়া দিবারাত্র লক্ষ্মীজনার্দ্দনের সেবায় নিযুক্ত থাকে। অতিথিগণের আহারের বন্দোবস্ত করে। পূর্ব্বের ন্যায় তুলসী-চরণে মালা গাঁথিয়া দেয় ও বর কামনা করে। অদ্য সন্ধ্যার সময় সুকুমারী তুলসী-চরণে মালা গাঁথিয়া দিতেছে ও কি বর মাগিতেছে। সুকুমারীর চক্ষুদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে। ম্লানমুখী কাতরকণ্ঠে তুলসীর নিকট, লক্ষ্মীজনার্দ্দনের নিকট স্বামীর আগমন কামনা করিতেছে। স্বামীর সন্দেহ যাহাতে দূর হয়, সেই ভিক্ষা মাগিতেছে। স্বামীর মঙ্গল মাগিতেছে, এমন সময় সুকুমারীর পশ্চাৎ দিকে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকের ছায়া লক্ষ্মীজনার্দ্দনের উপর পড়ায় সুকুমারী পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া দেখিল, একটী যুবতী স্ত্রী পশ্চাৎ দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটী অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুকুমারী দেবতাকে প্রণাম করিয়া স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

যুবতী কহিল, "ব্রাহ্মণকন্যা, আমার নাম কিরণ।" কিরণ সুকুমারীকে বিষ খাওয়াইবার জন্য সুরেশের সহিত সদানন্দের বাটীতে আসিয়া প্রথমে লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। সেখানে সুকুমারীকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় না পাইয়াই বুঝিল যে, এই সুকুমারী। সুকুমারীর সরলতাময় প্রশান্ত মূর্ত্তি, অলোকসামান্য রূপ, ম্লান মুখকান্তি, দেখিয়া পাপিয়সী কিরণ অন্তরে শিহরিয়া উঠিল ও বিস্ময়জড়িত নেত্রে সুকুমারীর মুখপানে

সেই মোহিনী দেবীমূর্ত্তি পানে চাহিয়া রহিল। সে যেন কোন দেবকন্যার সম্মুখে উপস্থিত। ভয়ে তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সুকুমারী কিরণের হাত ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। কিরণ কলের পুত্তলিকার মত সুকুমারীর সঙ্গে সঙ্গে বাটীর ভিতর গেল। সুকুমারী অতি যত্ন সহকারে কিরণের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। কিরণের সমস্ত দিবস আহার হয় নাই। কিরণ দিবসে সুরেশের সহিত কোন স্থানে লুকাইয়া ছিল। সন্ধ্যা হইলে সদানন্দের বাটীতে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। কিরণের আহার হইলে সুকুমারী হাত ধরিয়া তাহাকে আপন ঘরে লইয়া গেল এবং মধুর বচনে কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথায় ?" কিরণ মিথ্যা কথা কহিতে যাইতেছিল, কিন্তু কেন যেন পারিল না; বলিল, "রাইপুরে"।

সুকুমারী। তোমার পিতার নাম ?

কিরণ। কৃষ্ণলাল রায়।

সুকুমারী শিহরিয়া উঠিল, কিরণ সুকুমারীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল; বলিল, "আমার স্বামী তোমার পিতার বাটীতে একদিন ভুলক্রমে গিয়াছিলেন।" সুরেশ কিরণকে তাহার পরিচয় সম্বন্ধে যেরূপ বলিতে শিখাইয়া দিয়াছিল, কিরণ সুকুমারীর সরলতা ও অমায়িক ব্যবহারে তাহা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সরল ভাবে নিজের পরিচয় দিতে লাগিল। যেন সুকুমারী তাহার কত দিনের পরিচিত। কিরণ মন খুলিয়া কথা কহিতেছিল। সুকুমারী মনে মনে আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল এবং কিরণের স্বামীর ভ্রমই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ, তাহাই মনোমধ্যে আন্দোলন করিতেছিল। কিন্তু সেই জন্য কিরণের উপর

সুকুমারীর কোনরূপ সদয় ভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। সুকুমারী সকলই তাহার অদৃষ্টের দোষ, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল, ভাবিয়া কিরণকে যত্ন করিতে অবহেলা করিল না। এরূপ অবস্থায় হয়ত অন্য স্ত্রীলোক কিরণের সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিত না। কিন্তু সুকুমারী পূর্ব্ববৎ সস্নেহ ভাবে কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাড়ী ত্যাগ করিয়াছ কেন?" কিরণ এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। সুরেশ তাহাকে যে কথা শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহা সে অনেকক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। কিরণ ইতস্ততঃ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। সুকুমারী কিরণকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অন্য কথা পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার স্বামী তোমার সহিত দেখা শুনা করেন?"

কিরণ। সাত বৎসর বাদে একদিন দেখা হইয়াছিল; সে তোমাদের বাটী হইতে যাইবার পর।

সুকুমারী। তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বোধ হয় তিনি আমাদের বাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছিলেন। কিরূপে তিনি আমার স্বামী কি না, আমি প্রথমে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তিনি আমার স্বামী নহেন, তাহা বুঝিয়াও যখন তিনি আমার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন আমি যে তাহার হস্ত কামড়াইয়া পলায়ন করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয়, তিনি তোমাকে বলিয়া থাকিবেন।" কিরণের স্বামীর সহিত এরূপ কোন কথা হয় নাই। কিরণ মনে মনে স্পষ্টই বুঝিল যে, তাহার স্বামী সুকুমারীর বুদ্ধি-কৌশলে সুকুমারীর গাত্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিরণ পরে বলিল, "না, এ সব কথা হয় নাই।" তখন সুকুমারী কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি

কার সঙ্গে এলে?" কিরণ চুপ করিয়া রহিল। আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সুকুমারী কিরণের গা মুছাইয়া দিতে বসিল। আলুথালু চুল গুলি ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিল। কিরণকে কত আদর করিল, কিরণ সুকুমারীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পাপ হৃদয় সুকুমারীর সরলতায়, সুকুমারীর স্নেহ মাখা কথায় গলিয়া গেল। সে সুরেশকে মনে মনে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। সুরেশ যে একজন বিষম পাপী, সে বুঝিল। পাপীয়সী নিজের পাপের কথা ভাবিল। সুকুমারী কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে ও নিজে কিরূপে অবহেলায় সতীত্বের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে, তাহাও ভাবিল। সুরেশকে পরম শত্রু মনে করিল। সে তাহার সতীত্ব হরণ করিয়াছে, এক্ষণে আবার তাহাকে স্ত্রীহত্যারূপ মহাপাপে ডুবাইতে চাহিতেছে, ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল। পিতামাতার স্নেহ মমতা ভুলিয়া, স্বামীর ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিয়া, সতীত্বকে পদদলিত করিয়া জাতি কুলমান বিসর্জ্জন দিয়া, কিরণ যে সমস্ত পাপকার্য্য করিয়াছে, তাহা একেবারে তাহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তাহার হৃদয়ে ঘোর নরকযন্ত্রণা সমুত্থিত হইল। সে সুকুমারীর মধুর প্রকৃতি, সস্নেহ সম্ভাষণ, সদয় ব্যবহার, ধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ দেখিয়া সুকুমারী মানবী কি দেবী, তাহা স্থির করিতে পারিল না। তাহার স্বামী যদিও ভুলক্রমে সুকুমারীর পিতার বাটীতে জামাতা বলিয়া এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল বটে, সুকুমারী আপন সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, কিরণ সুকুমারীর কথা সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করিয়াছিল। এক্ষণে আবার ভাবিল, যে অসতী, তাহার হৃদয়ে এত গুণ বিরাজমান থাকিতে পারে না। ধর্ম্মে এতদূর প্রগাঢ় ভক্তি

অসতীর জীবনে সম্ভবে না। শৈশবের সরলতা অসতীর হৃদয়ে বাস করিতে পারে না, অসতীর হৃদয় এত কোমল হইতে পারে না। অসতী যতই ধর্ম্মের ভান করুক না কেন, তাহার কপটতা বহুক্ষণ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারে না। কিরণ অল্পক্ষণ মধ্যে এই সমস্ত ভাবিল এবং হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সুকুমারীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সুকুমারী অতি ব্যাকুল ভাবে কিরণের ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিল; অতি আদরের সহিত নিজাঞ্চলে কিরণের নয়ন-জল মুছাইয়া দিয়া কিরণের দুঃখের কারণ পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিরণ তখন আপন পাপ জীবনের সমস্ত ঘটনা একে একে অকপটে সুকুমারী সমীপে বিবৃত করিল। সুরেশ যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বলিল। স্বামীর প্রণয় উপেক্ষা করিয়া সে সুরেশের ভালবাসায় কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহাও বলিল। পরিশেষে কাতরকণ্ঠে সুরেশের পরামর্শে সুকুমারীকে বিষদান করিতে আসিয়াছে, তাহা জানাইল এবং বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বিষের কৌটা বাহির করিয়া সুকুমারীকে দেখাইল। কিরণের ক্রন্দনে সুকুমারীর মাতা ও বাটীর পরিচারিকা প্রভৃতি অনেকে সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে কিরণের কথা শুনিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। সুকুমারীর নির্ব্বোধা মাতা সুকুমারীকে যেন বিষ দিয়াছে, এই ভাবিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সদানন্দ দৌড়িয়া বাটীর ভিতর আসিল; একটা বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইত্যবসরে কলঙ্কিনী কিরণবালা বিষের কৌটা খুলিয়া কালকূট আপনি পান করিল, ও সমস্ত বিষ এককালে গলাধঃকরণ করিয়া, কিরণ সুকুমারীর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিল। অভাগিনী অধিক

কথা বলিতে পারিল না। বিষের জ্বালায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। পুনরায় সুকুমারীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে চিরজন্মের মত বিদায় চাহিল; এবং দেখিতে দেখিতে কিরণবালা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। সুকুমারী রোদন করিতে লাগিল। কিরণ যে তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তাহা একবারও ভাবিল না। কিরণের মৃত্যুতে যেন আপনার এক সহোদরা ভগিনীকে হারাইল, এই অনুভব করিয়া সুকুমারীর হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। সকলে সুকুমারীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। সুকুমারী তুমিই ধন্য। তোমারই জন্ম সার্থক—লক্ষ্মীজনার্দ্দনের নিকট প্রার্থনা করি, যেন সকলে সুকুমারীর মত পরদুঃখে কাঁদিতে শিখে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুকুমারী কখনও স্বপ্নেও কাহারও অনিষ্টচিন্তা করে নাই। তবে কি জন্য সুরেশ তাহার প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সুকুমারী বড়ই চিন্তাযুক্ত হইল। সুরেশ কেন এতদূর শত্রুতা করিতেছে; তাহাকে মারিয়া সুরেশের কি ইষ্টসাধন হইবে; সুকুমারী তাহাই মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল। এদিকে সদানন্দ সুকুমারীর হত্যা সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা শুনিয়া সুরেশকে লোকজনের সাহায্যে একবারে বাঁধিয়া ফেলিল। সুরেশ সেদিন তখন মদ খাইতে সবে আরম্ভ করিয়াছিল; লোকজনের আগমনে প্রথমে কিছু বিরক্ত হইল। পরে যখন দেখিল, ব্যাপার কিছু গুরুতর তখন ভাবিল, বোধ হয় তাহার ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ হইয়াছে। সে তাহাকে বাঁধিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সকলে মিলিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল; এবং ঘরে চাবি দিয়া সদানন্দ পুলিশে সংবাদ দিবার জন্য লোকজন লইয়া সত্বর চলিয়া গেল। সদানন্দ যাইবার পূর্ব্বে সুরেশকে বলিয়া গেল যে, "ধর্ম্ম এখনও আছে, তুই সুকুমারীকে মারিবার জন্য যাহাকে আনিয়াছিলি, সে নিজে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। তুই এক ব্রাহ্মণকন্যার সতীত্ব হরণ করিয়া আবার অন্য এক ব্রাহ্মণকন্যার প্রাণ হরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলি! সুকুমারীর কথায় তোর সব অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, আজ গুরুদেব স্বয়ং আসিলেও তোর রক্ষা নাই। তোর

পাপের সমুচিত দণ্ড না দিয়া আমি জলগ্রহণ করিব না। এই আমি পুলিশে চলিলাম।" এই বলিয়া সদানন্দ চলিয়া গেল। ভয়ে সুরেশের হৃৎকম্প হইল। সে তখন স্পষ্ট বুঝিল যে, আর তাহার রক্ষা নাই। ভয়ে সে কাঁপিতে লাগিল। বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অনেক চেষ্টা করিল। বন্ধন অতিশয় দৃঢ় ছিল। সুরেশের মুক্তিচেষ্টা ফলবতী হইল না। সুরেশ চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিল। এখনি পুলিশ আসিয়া তাহাকে ধরিবে, এই ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। একজন দাসী আসিয়া সুকুমারীর নিকট সুরেশের লাঞ্ছনার কথা জানাইল। দাসী বলিল, "কর্ত্তাবাবু সুরেশকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া পুলিশ ডাকিতে গিয়াছেন। ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া চাবিটী আপনার নিকট দিবার জন্য আমাকে দিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া চাবিটী দাসী সুকুমারীর হস্তে দিল। দাসী বলিল, "এবার আর সুরেশের নিস্তার নাই। চুরি করিয়া একবার তোমার জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে, এবার নিশ্চয়ই তাহাকে জেলে যাইতে হইবে, পাথর ভাঙ্গিতে হইবে, এইবার বুঝিতে পারিবে, কি রোগের কি ওষুধ।" এই বলিয়া দাসী চাবি দিয়া চলিয়া গেল। দাসী চলিয়া গেলে, সুকুমারীর মন সুরেশের ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুকুমারী ভাবিল, মনুষ্য আপন জীবনে নির্ব্বোধের ন্যায় কত রূপই কার্য্য করে। সুরেশ নির্ব্বোধ না হইলে সে আমাকে মারিতে যাইবে কেন? এত লাঞ্ছনা কেন সহ্য করিবে? সুকুমারী সুরেশের এতাদৃশ গর্হিত কার্য্যকে নির্ব্বুদ্ধিতার ফল ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতে পারিল না। বুদ্ধি থাকিলে লোকে যে এরূপ ঘোরতর পাপের কার্য্য করিতে পারে, সুকুমারীর সরল হৃদয়ে সে

বিশ্বাস স্থান পাইল না। সুকুমারীর হৃদয় সুরেশের জন্য বড়ই ব্যথিত হইল। সুরেশ জেলে যাইবে, পাথর ভাঙ্গিবে, তাহারা তাহাকে খাইতে দিবে না, শুইতে দিবে না, কত কষ্ট দিবে, কত মারিবে, আমার জন্য সুরেশকে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই ভাল ছিল; সুকুমারী এইরূপ ভাবিল, তাহার সরল প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল এবং গুটীকতক টাকা লইয়া সুকুমারী সুরেশ যে ঘরে বদ্ধ ছিল, সেই ঘরের দিকে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাবি খুলিয়া সুকুমারী সুরেশ যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। রাত্রি তখন দশটা হইবে। সুকুমারীকে দেখিতে পাইয়া সুরেশের সর্ব্ব শরীর রাগে কাঁপিয়া উঠিল। সুকুমারী যে তাহার সকল কষ্টের কারণ, সুরেশের মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। সুকুমারী না থাকিলে সে সদানন্দের বিষয় হইতে বঞ্চিত হইত না। আর সে বিষয় হইতে বঞ্চিত না হইলে সুকুমারীকে মারিবার জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইত না, এরূপ বিপদে সে পড়িত না, অতএব সমস্তই সুকুমারীর দোষ। সেই সুকুমারী তাহার সম্মুখে উপস্থিত। সে নিশ্চয়ই তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছে, এই ভাবিয়া সুরেশ সুকুমারীকে গালি দিতে লাগিল ও তাহাকে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল। সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশ, তুমি আমায় খুন করিতে চাহিয়াছিলে কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি?"

সুরেশ। তোমাকে কে খুন করিতে চাহিয়াছে? তুমি বুঝি আমার আপন মুখ হইতে আমার দোষ স্বীকার করাইয়া লইতে চাহ? তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে বেশ সাক্ষী দেওয়া

চলিবে। অন্য বেশি কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবে না।

সুকুমারী। তুমি অতদূর কেন ভাবিতেছ? আমি কি তোমার কখন কোন অনিষ্ট করিয়াছি যে, তুমি আমাকে অতদূর শত্রু বলিয়া মনে করিতেছ?

সুরেশ। অনিষ্টের কথা তুমি আবার মুখে আনিতেছ? তুমি আমার বিষয়-সম্পত্তি আমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছ। আমাকে পথের ভিখারী করিয়া নিজে পরম সুখে দিন কাটাইবে সেই চেষ্টায় দিবারাত্রি আছ; আবার বলিতেছ, তুমি আমার কি অনিষ্ট করিয়াছ?

সুকুমারী। তোমার মাতুলের সম্পত্তি আমি লইব, তোমাকে কে বলিল?

সুরেশ। যন্ত্রণায় আমার প্রাণ যায়, আমি আর বকিতে পারি না। মামা তোমায় দানপত্র লিখিয়া দিবেন; তুমি কি তা জান না?

সুকুমারী। তোমার মাতুল আমাকে বিষয় লিখিয়া দিবেন বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি লইব তোমায় কে বলিল?

সুরেশ সেই যন্ত্রণামধ্যেও হাসিল ও বলিল, এত বিষয় তুমি ছাড়িয়া দিবে, এই কথা তুমি আমাকে বুঝাইতে চাহ?

সুকুমারী। পরে জানিতে পারিবে। সুরেশ, আমি তোমার মাতুলের বিষয়ের প্রত্যাশী নহি, তাহা তুমি জানিও। এক্ষণে আমি তোমার বন্ধন খুলিয়া দিতেছি, তুমি এই কয়েকটী টাকা লইয়া শীঘ্র পলায়ন কর, পুলিশ আসিবার আর বিলম্ব নাই। তুমি জানিও তোমার মামার বিষয়ে আমার অণুমাত্রও লোভ নাই।

সুকুমারী এই কথা বলিয়া সুরেশের বন্ধন খুলিয়া দিল ও

ত্রস্তভাবে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। সুরেশ কতকক্ষণ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া সত্বরে মাতুলের বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ও অন্ধকার আশ্রয় করিয়া একদিকে পলায়ন করিল।

সুকুমারী যে তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সুরেশকে এই ঘোর বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিল, পাপিষ্ঠ সুরেশ কি তাহা একবার হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল? স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন যে একজন অপরের উপকার করিতে পারে, মনুষ্য তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। মনুষ্য সৃষ্টির প্রধান জীব, কিন্তু মনুষ্য কেন এতদূর অধঃপতিত, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন। ফলতঃ সুরেশ ভাবিতেছিল যে, মাতুলের বাটী হইতে তাহাকে সরাইয়া দিয়া সুকুমারী মাতুলের বিষয় প্রাপ্তির পথ নিজে আরো সুগম করিয়া লইল। নতুবা সুরেশকে মুক্ত করিয়া দিবার অন্য কি কারণ থাকিতে পারে? এস, আমরাও সকলে বলি, অন্য কোন কারণ কখনই থাকিতে পারে না! হা মনুষ্য! মনুষ্য জন্ম না দিয়া বিধাতা তোমাকে কেন কীটাণুকীট করেন নাই—তাহা হইলে তুমি যে অধিক সুখী হইতে পারিতে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে সদানন্দ পুলিশ লইয়া আসিয়া সুরেশ যে গৃহে বদ্ধ ছিল, সেই স্থানে গমন করিল। কিন্তু সুরেশের গৃহদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া ও সুরেশকে দেখিতে না পাইয়া সদানন্দ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল। সদানন্দ গৃহের চাবি সুকুমারীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল, অতএব সুরেশের পলায়নের কারণ বুঝিতে সদানন্দের অণুমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু সে কথা পুলিশকে কিছু না বলিয়া সদানন্দ, সুরেশ পলায়ন করিয়াছে, তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক ধরিতে হইবে, পুলিশের নিকট বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরে পুলিশের হস্তে কিরণ-বালার মৃতদেহ সমর্পণ করিয়া সদানন্দ পুলিশকে পুনরায় সুরেশকে ধরিবার জন্য অনুরোধ করিল; এবং পুলিশকে যথাসাধ্য দক্ষিণাদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিল। পুলিশও কিরণের মৃত্যুর কারণ অবগত হইয়া সদানন্দকে মিষ্ট বাক্যে আশ্বস্ত করতঃ প্রস্থান করিল এবং যথাসময়ে কোম্পানির ডাক্তারখানায় কিরণের মৃতদেহ পাঠাইয়া দিল। ডাক্তারখানায় কিরণের মৃতদেহের পরীক্ষা লওয়া হইল এবং বিষভক্ষণে মৃত্যু হইয়াছে, এই স্থির হইলে পর, কিরণের পিতামাতাকে সংবাদ প্রেরণ করা হইল। পুলিশ কিরণের পিতামাতার বিষয় সদানন্দের নিকট পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। এক্ষণে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী কিরণের পিতার নিকট সংবাদ দিতে গেল। কিরণের পিতা

মধ্যাহ্ন সময়ে আহার করিতে যাইবেন, এমন সময় উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া কিরণের পিতাকে ডাকিল। বাটীতে পুলিশের লোকের শুভাগমন দর্শনেই কিরণের পিতার চক্ষুঃ মস্তকে উত্থিত হইল; এবং তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গৃহিণীকে অনুরোধ করিলেন। গৃহিণী স্ত্রীলোক হইলেও কিরণের পিতা অপেক্ষা কথঞ্চিৎ সাহসী ছিলেন। তিনি অবগুণ্ঠনে বদন অর্দ্ধাবৃত করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীকে তাহার আগমনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারী সদানন্দের বাটীতে কিরণের গমন হইতে ডাক্তারখানায় তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিল যে, "যদি আপনাদের কন্যার সৎকার করিতে ইচ্ছা থাকে, আপনারা সত্বরে ডাক্তারখানায় গমন করুন; নতুবা মৃতদেহ জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে।" কিরণ বাটী হইতে চলিয়া গেলে কিরণের পিতা অপমানে মৃতকল্প হইয়াছিলেন। এক্ষণে কিরণের অপমৃত্যু ও অপমৃত্যুর কারণ ও সুরেশের সহিত তাহার অবৈধ প্রণয় ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া সেইদিন রাত্রে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। কিরণের জননী অপোগণ্ড কয়টী শিশুসন্তান লইয়া সংসারসাগরে ঝাঁপ দিলেন। বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল অপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইল। কৌলীন্যপ্রথাকে চির আশীর্ব্বাদ করিয়া আমরা এক্ষণে সদানন্দের বাটীতে পুনরায় গমন করিব।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশ পলায়ন করায় সদানন্দের রোষের ও ক্ষোভের আর পরিসীমা রহিল না। সদানন্দ সুরেশকে ধরিবার জন্য পুলিশের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিতে লাগিল। সুকুমারী অনেক বারণ করিয়াছিল, কিন্তু সদানন্দ সুকুমারীর কথা এবার আর শুনিবে না বলিল। সদানন্দ আপন গর্ব্ভধারিণীকে কেহ হত্যা করিতে চাহিলে বোধ হয় এতদূর ক্রুদ্ধ হইত কি না সন্দেহ। সুরেশকে ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া সদানন্দ সুকুমারীকে কিছু বলিতে পারিল না। অন্য কেহ হইলে সদানন্দ তাহাকে একবার দেখিয়া লইত; কিন্তু সুকুমারী সুরেশকে ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া সদানন্দ বাহিরে যে ভাবই প্রকাশ করুক না কেন, অন্তরে সুকুমারীকে দেবী বলিয়া সদানন্দের প্রতীতি জন্মিয়াছিল। দেবী না হইলে মানুষের হৃদয়ে এতদূর ক্ষমা কি সম্ভবে? এরূপ সরলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, মানুষে কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? সুরেশ সুকুমারীকে খুন করিবার জন্য এতদূর উদ্যোগ করিয়াছিল, কিরণবালা ইচ্ছা করিলেই সুকুমারীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতে পারিত, তথাপি সুরেশের উপর সুকুমারীর অণুমাত্র রাগ বা ঘৃণা হয় নাই। সুরেশ নির্ব্বোধ বলিয়াই এরূপ কার্য্য করিয়াছিল, সুকুমারীর মনে এই রূপই ধারণা হইয়াছিল। অতএব সদানন্দ কেন, আমরা সকলেই সুকুমারীকে দেবী জ্ঞানে পূজা করিতে প্রস্তুত হইতে পারি। এরূপ অলৌকিক গুণসমুদয় দেবী ভিন্ন অপরে সম্ভবে না। মনুষ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে যেমন পশুত্বে পরিণত

করিতে পারে, তেমনি ইচ্ছা করিলে সদ্‌বৃত্তিগণের পরিচালনা দ্বারা দেবতাপদে আপনাকে অভিষিক্ত করিতে সক্ষম হয়। সুকুমারী সামান্যা বালিকা; কিন্তু সুকুমারী নরনারীর শিক্ষার স্থল। সদানন্দ সুকুমারীর গুণাবলী ভাবিতে ভাবিতে গর্ব্বে স্ফীত হইত; কেননা, সুকুমারী সদানন্দের মাতা। তাহার মাতা মানুষী নহে, দেবী; একি সামান্য ভাগ্যের কথা? যাহা হউক, সদানন্দ সুরেশকে ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, অনেক কৌশল অবলম্বন করিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। পরি-শ্রমে, নৈরাশ্যে, উদ্বেগে, সদানন্দের জ্বর হইল; জ্বর প্রথমে অল্প হইল, পরে ক্রমশঃ জ্বরের প্রকোপ বাড়িল। সদানন্দ প্রলাপ বকিতে লাগিল। সুকুমারীর মহাভয় হইল। ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইল। সময়ে ডাক্তার বাবু আসিলেন। ডাক্তার বাবুর নাম হিরণ্যকুমার দাস, জাতিতে কৈবর্ত্ত। হিরণ্য বাবু ডাক্তারী শিখিয়া প্রথমে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রায়ই হিরণ্য বাবু ঔষধের পরিমাণ ভুলিয়া যাইতেন। রাস্তা হইতে কখন কখন ফিরিয়া আসিয়া প্রেসক্রিপ্‌সন সংশোধন করিয়া দিতে হইত। কখন কখন বাটী হইতে চাকর পাঠাইয়া রোগীর বাটী হইতে প্রেসক্রিপ্‌সন ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইত; এবং মেটেরিয়া মেডিকা হইতে ঔষধের পরিমাণ ঠিক করিয়া হিরণ্য বাবু নূতন প্রেসক্রিপ্‌সন লিখিয়া দিতেন। কাজেই এলো-প্যাথিক চিকিৎসা করা হিরণ্য বাবুর পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর হিরণ্যকুমার বাবুর বিশেষ বিদ্বেষ ভাব দাঁড়াইয়াছিল।

পরে একদিন ভুলক্রমে ঔষধের পরিমাণ ঠিক না হওয়ায় ঔষধ খাইয়া কোন রোগীর মৃত্যু হয়। রোগীর আত্মীয়বর্গ পুলিশে সংবাদ দেন। ডাক্তার বাবুর নামে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। অনেক হাঙ্গামের পর ডাক্তার বাবু অব্যাহতি পান। বাটী আসিয়াই ডাক্তার বাবু এলোপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত দূর করিয়া দেন। সেই দিন হইতেই এলোপ্যাথিক মতের চিকিৎসা যে অসার, ইহা তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ় ধারণা হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগীর আরোগ্য লাভ দূরে থাকুক, রোগীর মৃত্যু হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা, ইহা লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। আমরাও বলি, যে চিকিৎসায় এত হাঙ্গাম, এত বিপদ্, সে চিকিৎসায় কি প্রকারে রোগীর আরোগ্য হইতে পারে!! ইহা লোকেরও বুঝা উচিত। ডাক্তার বাবু হোমিও-প্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। লোকদিগকে বুঝাইলেন, অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ের মধ্যে রোগ আরোগ্যের এমন উপায় আর নাই। আরো বলিলেন, এ চিকিৎসায় ঠিক করিয়া ঔষধ দিতে পারিলে একবারের অধিক রোগীর ঔষধ খাইতে হয় না। কিন্তু ঔষধ নির্ণয় করা ডাক্তার বাবুর পক্ষে একটী গুরুতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ঔষধ ঠিক করিতে গিয়া বাঁশবনে ডোম কাণা গোছ হইয়া পড়িতেন। পুস্তক খুলিয়া দেখিতেন প্রায় সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধই এক রোগে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্য হইতে প্রকৃত ঔষধটী বাছিতে গিয়া ডাক্তার বাবুর গলদ্ঘর্ম্ম হইত। তবে ভরসার মধ্যে এই ছিল যে, ঔষধ ভুল হইলে রোগীর মৃত্যু হইবে না। আজিও সদানন্দের বাটীতে ডাক্তার বাবু আসিয়া ঔষধ বাছিতে বিশেষ গোলমালে পড়িলেন।

রোগী শয্যায় যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; ডাক্তার বাবুও পুস্তকের পাত উল্টাইতে উল্টাইতে যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। রোগীর তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে; ডাক্তার বাবুরও গলা শুকাইয়া আসিয়াছে। লজ্জায় জল চাহিতে পারিতেছেন না। রোগী প্রলাপ বকিতেছেন; ডাক্তার বাবুও মাথা গরম হইয়া ক্ষেপিবার যো হইয়াছেন। ডাক্তার আসিয়াছেন, এক্ষণেই রোগীর রোগ আরাম হইবে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ডাক্তার বাবুর কিন্তু পুস্তক দেখা শেষ হয় না। একখানির পর আর একখানি, আর একখানির পর আর একখানি, এইরূপে চার পাঁচ খানি কেতাব দেখা সাঙ্গ হইল। কিন্তু ডাক্তার বাবু যে আঁধারে সেই আঁধারে। তখন ডাক্তার বাবু চক্ষুঃ বুজিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া হোমিওপ্যাথিক বাক্সের মধ্যে শিশির গায়ে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিলেন। অঙ্গুলি যে ঔষধ স্পর্শ করিল, সেই ঔষধটী তুলিয়া লইলেন। সেই ঔষধ কতক পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে আদেশ দিলেন; এবং রোগীর বল আনয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তার বাবু ভিজিটের টাকা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরদিন সদানন্দের পেট ছাড়িয়া দিল। দুগ্ধ সদানন্দের পেটে সহিল না। ঔষধেও কোন গুণ করে নাই। রোগ বাড়িয়াছে। পেটের পীড়া আসিয়াছে। ডাক্তার বাবু পুনর্ব্বার আসিলেন। পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দিবসের প্রণালীমতে ঔষধ ঠিক করা হইল। রোগীর পথ্যের জন্য মুরগীর যূষ বন্দোবস্ত করিলেন; তা না হইলে রোগী মারা যাইবে, তাহাও জানাইলেন; এবং এরূপ রোগে মুরগীর যূষ

না খাইয়া কোন রোগীই আরাম হয় নাই, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে অবগত করিলেন। সুকুমারী একথা শুনিয়া বিশেষ ভীতা হইল। সুকুমারীর মাতা মুখরা, তিনি ডাক্তার বাবুকে বলিলেন যে, "তোমার, বাছা, রোগীকে অত দুদ খাওয়ান ভাল হয় নাই; তাহাতে পেট ছাড়িয়া দিয়াছে, আবার মুরগীর ব্যবস্থা করিতেছ! হিঁদুর ছেলে মুরগী খাইলে ক দণ্ড বাঁচিবে?" তখন ডাক্তার বাবু সুকুমারীর মাতার মূর্খতার জন্য বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত না হইয়া সামান্যবুদ্ধি স্ত্রীলোক তাঁহার মত বিচক্ষণ ব্যক্তির সহিত বাদানুবাদ করিতে সাহসী হইয়াছে, ইহাতে ডাক্তার বাবু বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ডাক্তার বাবু চিকিৎসাশাস্ত্রের মর্ম্ম সুকুমারীর মাতাকে বুঝাইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সুকুমারীর মাতা তাহা শুনিতে চাহিলেন না, অধিকন্তু বলিলেন যে, "বাছা, আমার এত বয়স হয়েছে; কিন্তু চক্ষুঃ বুজিয়া ঔষধ বাছিতে আমি আর কখনও দেখি নাই।" তখন ডাক্তার বাবু বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন; এবং নিজের ভিজিট সংগ্রহপূর্ব্বক সরিয়া পড়িলেন। সদানন্দ যেমন ভুল বকিতেছিল, তেমনই বকিতে লাগিল। ডাক্তার যখন চিকিৎসাসম্বন্ধীয় আপন যুক্তির অকাট্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য সুকুমারীর মাতার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন সদানন্দ সুরেশকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিতেছিল। সদানন্দ তাহার উপর আবার উঠিয়া উঠিয়া বসিতে লাগিল। সদানন্দ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; তখন সকলে পরামর্শ করিয়া হলধর চূড়ামণি বৈদ্যকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে হলধর চূড়ামণি আসিলেন। ইঁহার বয়স ষাইট পঁয়ষট্টি বৎসর হইবে। পরণে একখানি থান ফাঁড়া, গায়ে উড়ানি, উড়ানির কোণে ঔষধের পুঁটলি বাঁধা। পায়ে এক পা কাদা—হলধর চূড়ামণি কবিরাজ আসিয়া দেখা দিলেন। হরি! হরি! এই অসভ্য কবিরাজ রোগ আরাম করিবে? ডাক্তার বাবুরা যেন না শুনেন, শুনিলে উপহাসের হাসি হাসিবেন, নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, অসভ্য কবিরাজকে হয়ত পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন; এরূপ করিবার তাঁহাদের অধিকারও আছে। মানুষ মারিতে লোকের বাটীতে যাওয়া কবিরাজগণের অবশ্য বিশেষ ধৃষ্টতার কর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ কি? তাই বলি, ডাক্তার বাবুদের বলিয়া কাজ কি? তাঁহাদের যখন ষ্টেথেস্‌কোপ নাই, থার্ম্মোমিটার নাই, ঘড়ি নাই, চেন নাই, চোগা ও চাপকান নাই, তখন তাঁহাদের রোগীর নিকটে আশা পর্য্যন্ত মহাপাপের কর্ম্ম। যাহা হউক, অগত্যা বলি, হলধর চূড়ামণি হস্ত পদ ধৌত করিয়া রোগীর শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শুনিলে হাসি পায়, রোগীর নাড়ীর গতি নির্ণয়ের জন্য কবিরাজের একটী কাঁসার ঘড়ী পর্য্যন্ত ছিল না—কিন্তু তাঁহার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়াই সকলের মনে কেমন সাহসের সঞ্চার হইল। যদি দৈববাণী হইত যে, "আর ভয় নাই—রোগীর শীঘ্র আরোগ্য

লাভ হইবে," তাহা হইলে যেরূপ সকলের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইত; কবিরাজ মহাশয় প্রমুখাৎ "কোন শঙ্কা নাই" শুনিয়াই সকলের মন সেইরূপ প্রফুল্ল হইল। দ্বিতীয় ধন্বন্তরির ন্যায় শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া হলধর চূড়ামণি রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। জিহ্বা দেখিলেন—দেখিয়া রোগীর রোগের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া যখন শাস্ত্রোক্ত বচন আওড়াইতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন স্বয়ং সরস্বতী তাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান করিয়াছেন। হলধর চূড়ামণি যথার্থই একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। শুদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রে নহে, সংস্কৃত সকল শাস্ত্রেই তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। তাঁহাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হিরণ্যকুমার দাসের মত ঔষধের পরিমাণ ভুলিতে হইত না। ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তক সঙ্গে করিয়া চিকিৎসা করিতে যাইতে হইত না। রোগের লক্ষণ পুস্তক খুলিয়া মিলাইয়া লইতেও হইত না। পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণের বহু গবেষণার ফল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কবিরাজ মহাশয়ের কণ্ঠগত ছিল। সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আজ অসার অপদার্থ জ্ঞানে ভারতবাসিগণের উপেক্ষার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা কি সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা? কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; এবং ডাক্তার বাবুর চিকিৎসাধীন থাকিলে সদানন্দকে শীঘ্রই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে হইত, তাহাও কবিরাজ মহাশয় ইঙ্গিতে জানাইলেন। পরে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ও পরিজনবর্গকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে সদানন্দ রোগ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ কিছুদিন কোন

বিষয়কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিল না। সদানন্দের পীড়া হওয়ায় সুরেশকে ধরিবার জন্যও কোন আয়োজন হয় নাই। পুলিশও নিজ হইতে সুরেশকে ধরিতে কোন ক্লেশ স্বীকার করে নাই। সুরেশ এই অবসরে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছিল—তাহাকে ধৃত করিবার আশা আর নাই ভাবিয়া সদানন্দের মনও দিন দিন বড়ই ব্যাকুল হইতেছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষের প্রাবল্যে কুলীন জামাতৃগণের শ্বশুরালয় গমনাগমনেরও প্রাবল্য হইয়াছিল। রাস্তায় রাস্তায় কুলীনবংশাবতংসগণকে যখন তখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। অন্নাভাবে সকলেই ম্রিয়মাণ; সকলেই ভবিষ্যতে কি হইবে, কিরূপে দিন কাটিবে, এই ভাবনায় উদ্বিগ্ন। কিন্তু কুলীন জামাতৃগণের মন সদাই প্রফুল্ল। যেখানে যান, সেই খানেই টাকা না হইলে কথা পর্য্যন্ত কহেন না। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে শ্বশুর মহাশয়গণ অন্নাভাবেই মৃতকল্প—তাহাতে জামাতৃগণের প্রপীড়নে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত। একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে রাধানগরের চটীতে দুই জন আগন্তুক আহারাদির পর পরস্পর মনের কথা বলাবলি করিতেছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ; তিনি একটী থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন—অন্য জন শূদ্র, তিনি অপরের ধূমপানক্রিয়া দেখিতেছিলেন—যিনি ধূমপান করিতেছিলেন, তিনি আমাদের পরিচিত মহারথী কুলীন শশিশেখর শর্ম্মা। বাল্যকাল হইতে অন্য কোন কাজকর্ম্ম না থাকায়, পূর্ব্বে প্রায় কুলীন মহাশয়গণ সময়ের অপব্যয় না করিয়া অতি অল্প বয়স হইতেই আব্‌কারী মহলের সহিত বিশেষ পরিচিত হইতে চেষ্টা করিতেন। আমাদের আগন্তুক কুলীন মহাশয়ও সময়ের অপব্যয় করেন নাই, ইহা ধূমপান কার্য্যেই বুঝা যাইতেছিল। অপর ব্যক্তি তাঁহার ধূমপান ব্যাপার দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছিলেন; পরে অবকাশ হইলে শশিশেখর শর্ম্মা কলিকাটী অপরের হস্তে

দিলেন। তিনি তামাক খান না বলিয়া কলিকাটী রাখিয়া দিয়া শশিশেখরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নিবাস?"

শশিশেখর। রামনগর।

আগন্তুক। কোথায় যাইবেন?

শশিশেখর। হরিপুর।

আগন্তুক। কি প্রয়োজন?

শশিশেখর। সেই খানে আমি একটী বিবাহ করিয়াছি।

আগন্তুক। মহাশয় কি কুলীন?

শশিশেখর। হাঁ।

আগন্তুক। মহাশয়ের কয়টী বিবাহ?

শশিশেখর। খাতা না দেখিয়া বলিতে পারি না।

খাতা শশিশেখরের বস্ত্রের পুঁটুলিতে ছিল।

আগন্তুক। তবু আন্দাজ?

শশিশেখর। আন্দাজে বলা শক্ত।

আগন্তুক। আপনার তবে অনেক স্ত্রী?

শশিশেখর। হাঁ—কুলীনের অনেক স্ত্রী হবে না ত কি তোমার হবে?

গর্ব্বে শশিশেখরের চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

আগন্তুক। তা বটে, আপনার স্ত্রীর মধ্যে আপনি কয়জনকে ভাল বাসেন?

শশিশেখর। ভালবাসা কি? যেখানে বেশী টাকা পাওয়া যায়, সেই স্ত্রীকেই বেশী ভালবাসা যায়।

আগন্তুক। আপনার স্ত্রীর মধ্যে কয়জন সুন্দরী?

শশিশেখর। তা কি মনে আছে? হয়ত কাহার সহিত

একবার দেখা হইয়াছে, কাহার সহিত বিবাহের পর আর দেখা হয় নাই।

আগন্তুক। আপনার স্ত্রীর মধ্যে আপনার কি কাহাকেই সুন্দরী বলিয়া মনে ধরে নাই?

শশিশেখর। কুলীনের ছেলের মনে ধরা স্ত্রীর বড়ই ভাগ্যের কথা। তবে সুন্দরীর কথা যদি বলিলে তবে একটা মজার কথা বলি শুন। আমার এক শ্বশুরের নাম কৃষ্ণলাল রায়; তাঁহার বাটী রাইপুর। এখন ভুলক্রমে শ্বশুর বাটী মনে করিয়া আমি একদিন রায়পুরের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হই। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও বুঝিতে না পারিয়া আমাকে জামাতা বলিয়া আদর যত্ন করেন। পরে রাত্রে তাঁহার কন্যা আমার ঘরে আসিলে সে আমার শয্যায় প্রথমে আসিতে অস্বীকার করে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে আমি তাহার যথার্থ স্বামী কি না, তাই জানিবার জন্য আমাকে পরীক্ষা করে। তাহার মনে বোধ হয় কোনরূপে সন্দেহ হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া থাক, তবে বল দেখি, বিবাহের বাসরঘরে আমার আইমা তোমার নিকট হইতে কি জিনিষ একটী লইয়াছিলেন এবং তোমাকেই বা কি দিয়াছিলেন?" এ কথার আমি উত্তর দিতে না পারায় সে আমার নিকট কিছুতেই আসিতে চাহিল না। আমি তাহার হাত ধরিলে সে আমাকে এমন কামড়াইয়া লইল যে, এপর্য্যন্ত তাহার দাগ রহিয়াছে। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, সেও ঘর হইতে পলায়ন করিল।" এই বলিয়া সে বাহুমূলে একটী দাগ দেখাইল। এবং কহিল, "ছুঁড়িটে যেমন দেখিতে সাক্ষাৎ ভগবতী, স্বভাব চরিত্রও তাহার

তেমনি ভাল। বলিতে কি, আমি ত কুলীনের ছেলে—কিন্তু সে যদি আমার প্রথম স্ত্রী হইত, তাহা হইলে আমি লক্ষ টাকা পাইলেও আর বিবাহ করিতাম না। সুন্দরীর কথা যদিবলিলে, সেই এক সুন্দরী দেখেছি—না হ'লে আমাদের পাড়ার পাঁচীও সুন্দরী"। এই বলিয়া শশিশেখর চুপ করিলেন। এই চটীর অন্য এক কামরায় সেই সময়ে আর একটী পথিক অনন্যমনে শশি-শেখরের কথা শুনিতেছিলেন। শশিশেখর চুপ করিলে তিনি আপনার বস্ত্রের পুঁট্‌লি, ছাতা, খাতা প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন; এবং আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "উঃ আমি কি পাষণ্ড! আমি সুকুমারীর সতীত্বে সন্দেহ করিয়া তাহাকে কি পর্য্যন্তই না অপমান করিয়াছি। আজি যাহা শুনিলাম তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, সুকুমারী পরমা সতী—আমি সতীর অপমান করিয়াছি, আমি এখনি রায়পুর যাত্রা করিব। সুকুমারীর সহিত দেখা করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিব, সে আমাকে থাকিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহার নিকট চিরদিন থাকিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিব। আমি বিশেষ অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি। সতীর মনে অন্যায় কষ্ট দিয়াছি।" এই বলিয়া এই পথিকটী রায়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হৃষীকেশ শর্ম্মা, সুকুমারীর স্বামী। ইনিও এক শ্বশুরালয় হইতে অন্য শ্বশুরালয় যাইবার সময় এই চটীতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি সুকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ত্বরিত গতিতে রায়পুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হৃষীকেশ শর্ম্মা আজ প্রফুল্ল মনে সুকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছেন। হৃষীকেশ শর্ম্মার মন অনেক দিন এমন প্রফুল্ল হয় নাই। হৃষীকেশ একমনে চলিতেছেন, ও মনে কতই সুখের ভাবনা ভাবিতেছেন? আবার চলিতেছেন। এইরূপ কত পথ অতিক্রম করিয়া হৃষীকেশ কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; এবং একটী পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষের তলে বিশ্রামার্থ বসিলেন। চির সহচর থেলো হুঁকায় কলিকা চড়াইয়া ধূমপান করিতে করিতে হৃষীকেশ শর্ম্মা সুকুমারীর কথা ভাবিতে লাগিলেন, আর ধূমপান করিতে লাগিলেন। তখন হৃষীকেশ শর্ম্মার ভাবনার স্রোত এত প্রবল হইয়াছিল যে, কখন বা একবারে হস্তের হুকাটী মুখে লাগাইতে ভুলিয়া যাইতেছিলেন, পরক্ষণে আবার যেন চেতনা পাইয়া দ্বিগুণতর আগ্রহ সহকারে ধূমপান করিতেছিলেন। সুকুমারীর সহিত প্রথমে দেখা হইলে কি বলিবেন, পরে কি বলিবেন, তৎপরে বা কি বলিবেন, হৃষীকেশ শর্ম্মা মনে মনে এই সমস্ত ঠিক করিয়া লইতেছিলেন। এমন সময় একটী পথিক সেই স্থানে আসিয়া জুটিল। পথিকের চক্ষুঃ দুটী রক্তবর্ণ, ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পমান, পরিধান ছিন্নবস্ত্র, মুখ শুষ্ক, কেশ তৈলবিহীন। পথিক আসিয়াই সেই বটবৃক্ষমূলে বিশেষ ক্লান্তিসূচক বাক্যে হৃদয়ের যাতনা প্রকাশ করিয়া বসিয়া পড়িল; ও ধূমপানের জন্য কলিকাটী চাহিল। হৃষীকেশ এতক্ষণ আপন মনে কি ভাবিতে-

ছিলেন; আগন্তুকের আগমন জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে যেন চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান"? "কলি-কাটী, একবার তামাক খাইতে ইচ্ছা করি।" "দাঁড়ান, এখনও ধরে নাই" এই বলিয়া হৃষীকেশ পুনরায় একমনে ধূমপান করিতে লগিলেন; এবং কতক্ষণ পরে কলিকাটী লইয়া আগন্তুকের সম্মুখে মাটিতে রাখিয়া দিলেন। আগন্তুক পাতার একটী নল প্রস্তুত করিয়া এতক্ষণ বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে ব্রাহ্মণের ধূমপানক্রিয়া পরিলক্ষ্য করিতেছিল, এক্ষণে কলিকাটী পাইয়া নলযোগে ধূমপান করিতে চেষ্টা করিল। দুই একবার টানিয়া বলিল, "ইহাতে কিছু নাই, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। দিন, আমি এক ছিলিম সাজি"। হৃষীকেশ শর্ম্মা কলিকা হইতে তামাক ও আগুন মাটীতে ফেলিয়া দিয়া হুঁকা কলিকাটী আপন বস্ত্রের পুঁটলির মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আগন্তুক মহা চটিয়া গেল। কিন্তু কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল এবং আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে আগন্তুক হৃশীকেশ শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাইবেন"? হৃষীকেশ "রায়পুরে সদা-নন্দ দত্তের বাটী" "কেন"? সেই স্থানে আমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। "আপনার স্ত্রীর নাম"? "সুকুমারী"। আগন্তুক বলিল, "সে ত সদানন্দের উপপত্নী।"

এই কথা শুনিয়াই রাগে হৃষীকেশের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। তখন তিনি দন্তে দন্তে নিষ্পেষণপূর্ব্বক ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় আগন্তুককে আক্রমণ করিলেন এবং আগন্তুককে ভূমিশায়ী করিয়া সবলে তাহার গলদেশ চাপিয়া ধরিয়া রহিলেন। হৃষীকেশ তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, পৃথিবী তাঁহার নয়নপ্রান্তে ঘুরিতেছিল,

তিনি যে তাহার পর কি করিলেন তাহা জানিতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন আগন্তুক সংজ্ঞাশূন্য নিস্পন্দ, হৃষীকেশ শর্ম্মা তখন তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন মনে করিয়া আপনার বস্ত্রাদি উঠাইয়া লইয়া সেই স্থান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। সুকুমারীর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ করা হইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কেশবচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে সদানন্দের বাটীতে লইয়া আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অবসর পান নাই, সেই জন্য এতদিন আনিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্রের স্ত্রীর নিতান্ত ইচ্ছা যে, সুকুমারীকে একবার দেখেন। একদিন কেশবচন্দ্র একখানি পাল্কীতে নিজে ও অন্য একখানিতে আপন স্ত্রী ও একটী পাঁচ বৎসরের পুত্রকে লইয়া সদানন্দের গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন। রাস্তায় কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই, পাল্কী-বাহকেরা যত শীঘ্র পারিতেছে আসিতেছিল, বাহকেরা বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটী বটবৃক্ষের তলে আসিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাল্কী নামাইল, কেশবচন্দ্র পাল্কী হইতে নামিলেন। নামিবা মাত্র একটী মনুষ্যদেহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটী শীর্ণকায় পুরুষ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, অতি অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে। তিনি উপবেশন করিয়া যেমন পুরুষটীর গাত্র স্পর্শ করিবেন, অমনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ যে সুরেশ"। সুরেশ হৃষীকেশ দ্বারা নিগৃহীত হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছিল। হৃষীকেশ শর্ম্মা তাহাকে মৃত মনে করিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ সুরেশ মরে নাই। কেশবচন্দ্র সুরেশকে প্রথমতঃ ডাকিতে লাগিলেন; উত্তর না পাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, গাত্রে হাত দিয়া নাড়িতে লাগিলেন, এদিকে সুরেশের ভগিনী

কান্না জুড়িয়া দিলেন। ছেলেটীও সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল। কেশবচন্দ্র সুরেশকে আপন পাল্কীতে উঠাইয়া নিজে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন; এবং যাহাতে সত্বরে কোন চটীতে গমন করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে বেহারাদিগকে আদেশ করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইলে কেশবচন্দ্র একটী চটী পাইলেন এবং সেই স্থানে থাকিয়া যথাসাধ্য সুরেশের চিকিৎসাদি করিবেন মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। কেশবচন্দ্র স্ত্রী পুত্র ও সুরেশকে পাল্কী হইতে নামাইয়া সুরেশের সেবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর সুরেশের জ্ঞান হইল। সুরেশ একটী দুইটী কথা কহিতে পারিল। ক্রমে সুরেশের ভগিনী সুরেশের উক্তরূপ অবস্থার কারণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুরেশও দুই এক কথায় তাহাকে দস্যুতে মারিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে বলিয়া ভগিনীর কৌতূহল নিবৃত্তি করিল। সুরেশের ভগিনী আবার কাঁদিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ ভ্রাতাকে একেবারে মারিয়া ফেলে নাই, এই জন্য অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। চটীদার সেই স্থানে চোর ডাকাতের ভয় নাই বলিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। সুরেশের সেবায় অনেক রাত্রি হইয়াছিল, বিশেষ সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই জন্য কাহার আর আহারাদি হইল না, কোনরূপে রাত্রিটা কাটিয়া গেল। পরদিন সুরেশ বড়ই দুর্ব্বল থাকায় সুরেশের ভগিনীর অনুরোধে কেশব-চন্দ্র সেদিন সে চটীতেই রহিয়া গেলেন। নানা কথায় দিনটা কাটিয়া গেল। সুরেশ সদানন্দের বাটী কেন ত্যাগ করিয়াছে, একথা সে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। সদানন্দ তাহাকে আর শ্রদ্ধা করে না, তাহার বাটীতে থাকিলে বিশেষ বিরক্ত হয়,

এই জন্য তাহার বাটী ত্যাগ করিয়া যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকে চলিয়া যাইতেছিল, এই বলিয়া সুরেশ ভগিনী ও ভগিনীপতিকে বুঝাইয়াছিল। সুরেশের ভগিনী মাতুলের ব্যবহারে মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন; এবং মাতুলের বাটীতে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ কি না, সমস্ত দিন তাহাই ভাবিতেছিলেন। এদিকে ক্রমশঃ রাত্রি আসিল; সকলে আহারাদি করিয়া আপন আপন শয্যায় শুইলেন। পাছে পুলিশ ধরে, সদানন্দ আসে, এই ভয়ে সুরেশের চক্ষুতে নিদ্রা আসিল না। সে তখন কতরূপ ভাবিতেছিল। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, মাঝে মাঝে শৃগালের ও গ্রাম্য কুক্কুরের তারস্বর ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শ্রুতি-গোচর হইতেছিল না। সকলেই নিদ্রিত, কেবল পাপীর চক্ষে ঘুম নাই। পাপিষ্ঠ সুরেশের পাপের ইয়ত্তা নাই। আবার সুরেশের কিছু লেখাপড়া জানা থাকায় পাপকার্য্য বুদ্ধি ও কৌশল সহকারে সম্পন্ন করিবার সুরেশের ক্ষমতা ছিল। সে ঘোর নাস্তিক; ঈশ্বরে, পাপপুণ্যে, তাহার অণুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। তাহার উপর সে অতিশয় মাতাল ও লম্পট ছিল। পরিশেষে অভাবের ঘোর তাড়নে সুরেশ চুরি করিতে শিখিয়াছিল। খুন করিতেও পশ্চাৎপদ ছিল না। সকল প্রকার পাপকার্য্যই সুরেশের অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের টাকা চুরি করিয়া কতদিন মদ খাওয়া চলিয়াছিল; তৎপরে সদানন্দের বাটী হইতে এটা সেটা যাহা পাইত, তাহাই দিয়া মদ খাইত। পরিশেষে চুরি করা যে একটা গর্হিত কাজ, তাহা সুরেশের হৃদয়ে উপলব্ধি হইত না। অনেক্ষণ সুরেশ কত কি ভাবিল; পরে

সেই গভীর রাত্রিতে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া আপনার ভাগিনেয়ের গলা হইতে স্বর্ণহার খুলিয়া লইল; এবং কেহ পাছে তাহার অনুসরণ করে, এই জন্য সেই চটীতে অগ্নি প্রদান করিয়া সুরেশচন্দ্র প্রস্থান করিল। সে ভাবিল, তাহাকে অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে সকলকে অগ্নি নির্ব্বাণে ব্যস্ত থাকিতে হইবে ও ততক্ষণ সে অনেক দূর গিয়া পড়িবে। ভগিনী ও ভগিনীপতি যে তাহার কিছু পূর্ব্বে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, এ কথা পাপীর হৃদয়ে একবারও উদিত হইল না। এক্ষণে আপনার পরিত্রাণের সুবিধার জন্য সকলকে পুড়াইয়া মারিতেও কুণ্ঠিত হইল না। ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নির উত্তাপে কেশবচন্দ্রও তাঁহার স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা কোলাহল করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। চটীদার উঠিয়া পড়িল। সকলের চীৎকারে নিকটস্থ লোক জড় হইতে লাগিল। সকলেই সকলকে অগ্নি নিবাইতে আদেশ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই অগ্নির নিকট যাইতে পারিল না। নিকটে পুষ্করিণী না থাকায় জল পাওয়া গেল না। দোকানঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, এমন সময় কেশবচন্দ্রের মনে পড়িল তাঁহার পুত্র ঘরের মধ্যে আছে; অমনি দৌড়িয়া ঘরের দিকে যাইতে চাহিলেন। অগ্নির বিষম উত্তাপে যাইতে পারিলেন না। "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, খোকা ঘরের মধ্যে আছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেশবচন্দ্রের স্ত্রীরও এতক্ষণ পুত্রের কথা মনে পড়ে নাই। এক্ষণে যথার্থই সর্ব্বনাশ হইয়াছে ভাবিয়া পাগলিনীর ন্যায় দৌড়িয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি চারিদিকে ঘেরিয়াছে, কাহার সাধ্য ঘরের নিকট যায়। কিন্তু স্নেহময়ী জননী পুত্রের জীবন রক্ষার

জন্য অগ্নিরাশির মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। কেশবচন্দ্রের স্ত্রী আর বাহিরে আসিতে পারিলেন না। প্রজ্জ্বলিত ঘরের মটকা পড়িয়া কেশবচন্দ্রের স্ত্রী ও পুত্রকে চাপা দিল। জননী পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়াই চিরনিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। যখন প্রভাত হইল, তখন পুলিশ আসিয়া পৌঁছিল। জলসংযোগে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া কেশবচন্দ্রের স্ত্রী ও পুত্রের দগ্ধাবশিষ্ট মৃতদেহ বাহির করা হইল, তখনও জননী পুত্রকে জড়াইয়া রহিয়াছে সকলে দেখিল। কিন্তু সুরেশের দেহ পাওয়া গেল না। পুলিশ সুরেশকে চিনিত এবং এ কর্ম্ম সুরেশের বলিয়া প্রকাশ করিল; সকলেরই সেই ধারণা হইল। কেশবচন্দ্র পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং সুরেশকে কেন আনিলাম, কেন বাঁচাইলাম, বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সকলে কত সান্ত্বনা করিতে লাগিল, পরে স্ত্রী ও পুত্রের দেহ শ্মশানগত করিয়া শূন্য হৃদয়ে শূন্য প্রাণে কেশবচন্দ্র সদানন্দের বাটীতে আগমন করিলেন; এবং সদানন্দকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুকুমারীও সমস্ত শুনিল। সদানন্দ রাগে দুঃখে পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিল। সুকুমারী কত কাঁদিল, সুকুমারীর বড় ইচ্ছা ছিল কেশবচন্দ্রের স্ত্রীকে দেখিবেন, দেবতা তাহাতে বাধ সাধিলেন। সুকুমারীর দুঃখের আর সীমা রহিল না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চটী ত্যাগ করিয়া সুরেশ যতক্ষণ পারিল ছুটিয়া চলিল। সে দূর হইতে গৃহ-দাহ-জনিত লোক-কোলাহল শুনিতে শুনিতে চলিল। তাহার হৃদয়ে কিন্তু এক ভাবনা, পাছে পুলিশ তাহাকে ধরে। ভগিনীর কি সর্ব্বনাশ হইল, পাপিষ্ঠের হৃদয়ে সে ভাবনা ক্ষণতরেও প্রবেশ করিল না। সুরেশের ইচ্ছা, সে নদী পার হইয়া পলায়ন করে। নদী সেস্থান হইতে পনর বিশ ক্রোশ তফাৎ। সুরেশ দুই তিন দিনের মধ্যে নদী পার হইতে পারিবে, তাহা হইলে পুলিশ তাহার অনুসন্ধান পাইবে না; এই ভাবিয়া যত শীঘ্র পারে চলিতে লাগিল। কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতা বশতঃ অধিক চলিতে পারিতেছিল না। প্রভাত হইলে সে একটী গ্রামের চটীতে আশ্রয় লইল; ও তথায় কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিল। এক স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে তাহার সাহস হইতেছিল না, পাছে পুলিশ আসিয়া ধরে। এদিকে সদানন্দ ও কেশবচন্দ্র পুলিশ সমভিব্যাহারে সুরেশের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। দিকে দিকে কনষ্টেবল প্রেরণ করিয়া, দারোগা মহাশয় সুরেশ পাছে নদী পার হইয়া পলায়ন করে, সেই জন্য নিজে সেই দিক আটকাইতে চলিলেন। সদানন্দ, কেশবচন্দ্র ও দারোগা মহাশয় দশ বার জন কনষ্টেবল সঙ্গে পাল্কীতে যাইতে লাগিলেন। দারোগা বাবু পুলিশের একজন বড় কর্ম্মচারী; কাজেই অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে

ছিলেন। ঘন ঘন বিশ্রামের আবশ্যক হইতেছিল। সদানন্দ ও কেশবচন্দ্রকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্রাম করিতে হইতেছিল। দারোগা বাবু যেস্থানে দয়া করিয়া বিশ্রামের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই স্থানের লোকজনের মুখ শুকাইয়া যাইতে লাগিল। কেহ মৎস্য, কেহ দুগ্ধ, কেহ মাংস বা অন্যান্য সামগ্রী দিয়া পুলিশের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। সুরেশ এতক্ষণ অনেক দূর গিয়া পড়িল, হয়ত তাহাকে পাওয়া যাইবে না, প্রভৃতি বাক্যে সদানন্দ ও কেশবচন্দ্র দারোগা মহাশয়কে বড়ই ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। প্রভুর তাহাতে বড় একটা লক্ষ্য নাই। তিনি যথাসময়ে আহার, যথাসময়ে নিদ্রা প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন না করিয়া পাল্কীতে উঠিতে চাহিলেন না। সদানন্দ ও কেশবচন্দ্রের অগত্যা দারোগা বাবুর রায়ে রায় দিতে হইতেছিল। বেহারা পরিবর্ত্তন করিতেও অনেক সময় যাইতে লাগিল। এই রূপে দুই দিনের রাস্তা পাঁচ দিন করিয়া দারোগা বাবু সুরেশকে ধরিতে চলিলেন। সুরেশ পদব্রজে পূর্ব্বেই নদীতীরে আসিয়াছিল। যখন নদীতীরে সুরেশ আসে, তখন অপরাহ্ন, বেলা তিন চারিটা। বায়ু কিছু প্রবল বেগে বহিতেছিল বলিয়া নৌকার মাঝিরা ওপারে যাইতে স্বীকার করে নাই; কাজেই সুরেশকে প্রকৃতি দেবীর দয়ার জন্য বিলম্ব করিতে হইতেছিল। বায়ুবেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া ফেলিল। নদীর বেগ শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তরঙ্গ সকল ভীষণভাবে উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। সুরেশ পার হইবার আশা ত্যাগ করিয়া নদীকূলে দাঁড়াইয়া, কোথায় যাইবে, কি করিবে, এই ভাবিতেছিল। এমন সময় কিছু দূরে দুই তিন খানি পাল্কী ও

তাহার সঙ্গে কতকগুলি কন্‌ষ্টেবল আসিতেছে, সুরেশ দেখিতে পাইল। সুরেশের মনে ভয় হইল, কি জানি, তাহাকেই বা ধরিতে আসিতেছে। আবার ভাবিল, তাহারা হয়ত অন্য কোন কার্য্যে যাইতেছে। পাল্কী ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল, এমন সময় সদানন্দ প্রথমেই পাল্কী হইতে নামিয়া সুরেশকে ধরিবার জন্য কন্‌ষ্টেবলগণকে আদেশ করিল। দারোগা বাবুও সেই সময় পাল্কী হইতে নামিয়া পড়িলেন। সুরেশ কোন দিকে আর পলায়নের সুবিধা না দেখিয়া একবার সদানন্দের দিকে চাহিল, সদানন্দ পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "ধর, শীঘ্র বদমায়েসকে ধর, বিলম্ব করিও না।" সদানন্দই তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে সুরেশ বুঝিল। তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সুরেশ নদীতে ঝাঁপ দিল। পরিত্রাণের অন্য আশা নাই সাঁতার দিয়া যদি পলাইতে পারে, এই মানস করিয়া পাপিষ্ঠ এক লম্ফে নদীগর্ভে নিপতিত হইল। বায়ু তখন প্রবল বেগে বহিতেছিল। তরঙ্গমালা বড়ই আনন্দে পরস্পর গলা জড়াইয়া খেলিতেছিল—যেন তাহাদের এমন দিন আর হইবে না। তরঙ্গমালা সুরেশকে পাইয়া ঘেরিয়া ফেলিল, যেন কত দিনের পর প্রাণের বন্ধুর সহিত তাহাদের সমাগম হইয়াছে। সুরেশকে তাহারা তাহাদের বক্ষঃ হইতে উঠিতে দিল না—সুরেশ একবার কেবল মাথা তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "উঃ আমাকে বাঁচাও, আর পারি না আমাকে বাঁচাও", এই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্ত আকাশে মিলিয়া গেল। সুরেশও নদীগর্ভে মহানিদ্রায় অভিভূত হইল, কেহই তাহাকে বাঁচাইল না, বা বাঁচাইবার চেষ্টা করিল না। কিন্তু যখন সদানন্দ দেখিল সুরেশ আর উঠিল না, তখন সে আর

থাকিতে পারিল না। সে "সুরেশকে বাঁচাও, যত টাকা লাগে দিব" বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। সুরেশ যতদূর পাপী হউক না, সুরেশের মৃত্যুতে সদানন্দ বড় কাতর হইয়া পড়িল। স্নেহ নীচগামী, সংসারে এরূপ দৃশ্য নিতান্ত বিরল নহে। কেশবচন্দ্র সদানন্দকে সান্ত্বনা করিয়া পাল্কীতে উঠিতে বলিলেন; এবং দারোগা বাবু কন্‌ষ্টেবল প্রভৃতির সহিত রায়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সদানন্দ বাড়ী আসিয়া সুরেশের মৃত্যুকথা সকলকে বলিল। সুকুমারী সুরেশের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া কাঁদিল। মৃত্যু এক রূপে আমাদের পরম বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করে। জীবিতাবস্থায় সুরেশের উপর যাঁহাদের বিশেষ রাগ ও ঘৃণা ছিল, সুরেশের মৃত্যুর পর তাঁহারাও সুরেশের দোষ ভুলিয়া গিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আহা, সুরেশ ভাল হইয়া বাঁচিয়া থাকিলে এত বড় বিষয়ের অধিকারী হইত, দশজনের একজন হইত, কত লোককে প্রতিপালন করিত, এইরূপ কথা অনেকের মুখে শুনা যাইতে লাগিল। সকলেই সুরেশের মৃত্যুতে অল্প বা অধিক দুঃখিত হইয়াছিল। সদানন্দের মন বড়ই বিষন্ন, সে আর বাড়ীতে থাকিতে চাহে না। কেশবচন্দ্রের স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যুতে সদানন্দ বিশেষ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে সুরেশের মৃত্যুতে সদানন্দের মন সংসারে একেবারে বীতস্পৃহ হইল। সুরেশ ও সুরেশের ভগিনী ভিন্ন সংসারে সদানন্দের আর কেহ নিকট আত্মীয় ছিল না। এক্ষণে তাহাদের মৃত্যুতে সংসার সদানন্দের পক্ষে বিশেষ কষ্টের হইল। সদানন্দের মনের সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পূর্ব্বের নৃশংস ব্যবহার সকল যখনই মনোমধ্যে উদিত হইত, তখনই সদানন্দের হৃদয়ে বড়ই যন্ত্রণা দিত। এ পাপ-সংসার যত শীঘ্র পরিত্যাগ করা যায়, ততই ভাল। সদানন্দের এইরূপ ধারণা বহুদিন হইতেই হইয়াছিল। সুরেশের ব্যবহারে

সদানন্দ সংসারে থাকিতে আরো বিরক্ত হইয়াছিল, কেবল সুকুমারীর মায়ায় সে সংসার ছাড়িতে পারিতেছিল না। এক্ষণে সদানন্দ একেবারে সঙ্কল্প করিল যে, সে কাশীবাস করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিবে। সে একদিন সুকুমারীকে ডাকিয়া বলিল, "মা, আমি আর সংসারে থাকিতে চাহি না, সংসারে থাকিতে আমার আর ভাল লাগে না। আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া অনেক দিন কাটাইয়াছি। তুমিই আমাকে সদ্‌গুরুর ন্যায় পাপপথ হইতে সৎপথে আনিয়াছ—ধনগরিমায় আমি অনেক পাপকার্য্য করিয়াছি—এক্ষণে তুমি অনুমতি কর যে আমি জীবনের শেষভাগ বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া অতিবাহিত করি। আমি মনে করিয়াছি যে, কাশীবাসী হইব। এই সমস্ত বিষয়, ধনসম্পত্তি তোমাকে দান করিতে মনঃস্থ করিয়াছি, তোমার তাহাতে মত কি?" সুকুমারী সদানন্দ বাটী ত্যাগ করিবে, শুনিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। সদানন্দের উপর সুকুমারীর বড়ই স্নেহ জন্মিয়াছিল—বিশেষ বড় কষ্টের এই সময় সদানন্দ সুকুমারী ও সুকুমারীর মাতাকে আশ্রয় দিয়াছিল। সমস্ত কারণে সুকুমারীর প্রাণ অতিশয় ব্যথিত হইল। সে সদানন্দকে এক্ষণে কাশী যাইতে অনেক নিষেধ করিল—কিছু দিন পরে যাইলেই চলিবে, বলিয়া কতই বুঝাইল কিন্তু সদানন্দ করযোড়ে বলিল "তুমি, মা, আমায় বাধা দিলে আমার যাওয়া হইবে না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন মণিকর্ণিকার তীরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি—এ সংসারে কোন সুখ নাই। বিষয়মদে মত্ত হইয়া যে সমস্ত পাপকার্য্য করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনেক সময় লাগিবে। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে

আমাকে যাইতে বল, নহিলে আমার যাওয়া হইবে না।”

সুকুমারী তখন বলিতে লাগিল, “সদানন্দ, আমরা তোমার আশ্রয়ে পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলাম। এক্ষণে তুমি কাশী যাইলে আমিও আমার মাতা আমরা আমাদের বাটীতে যাইব। এ বিষয় সম্পত্তির আশা আমি করি না। আমি দরিদ্র কুলীনের কন্যা, আমার এ বিষয়ে প্রয়োজন নাই। তুমি এ বিষয়ের অন্য বন্দোবস্ত কর। আমি মন খুলিয়া বলিতেছি যে, আমাকে বিষয় দিলে আমি লইব না, দশজনে লুটিয়া খাইবে। তুমি অন্যরূপে বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া কাশী যাও। তবে আমার ইচ্ছা লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজা ও অতিথিশালার সম্বন্ধে তুমি এরূপ বন্দোবস্ত করিবে, যেন কখন তোমার এ কীর্ত্তির লোপ না হয়। এ দুটী আমার বড় যত্নের সামগ্রী।” সদানন্দ অগত্যা সমস্ত বিষয় লক্ষ্মীজনার্দ্দনের নামে অর্পণ করিয়া কেশবচন্দ্রকে সেবায়ৎ স্বরূপ নিযুক্ত করিল। কেশবচন্দ্র প্রথমে অসম্মত থাকিলেও পরে সদানন্দের আগ্রহাতিশয়ে সদানন্দের সমস্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। সদানন্দ সুকুমারীর স্বামীর উদ্দেশ যদি পাওয়া যায় ও সুকুমারীর বাটীতে আসিয়া যদি সে বাস করে, তবে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজা ও অতিথিশালার ভার তাহার হস্তে দিবার জন্য কেশবচন্দ্রকে আদেশ করিল এবং তাহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ মাসিক এক শত টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিল। সুকুমারীর পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য কেশবচন্দ্রের উপর ভার হইল এবং সুকুমারীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া সুকুমারীকে দিবার জন্য

বন্দোবস্ত হইল। সুকুমারী সদানন্দের অতুল সম্পত্তি লোষ্ট্রবৎ ত্যাগ করিল দেখিয়া সুকুমারীর উপর সুকুমারীর মাতার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তিনি নির্জ্জনে সুকুমারীকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। কিন্তু সুকুমারী মাতার কথায় কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় সুকুমারীর মাতা অগত্যা চুপ করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সুকুমারীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; অতএব তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করা ও অরণ্যে রোদন করা উভয়ই সমান; এবং অনেক পাপে তাঁহার গর্ব্ভে এরূপ নির্ব্বোধ কন্যা জন্মিয়াছে এই স্থির করিয়া আপন অদৃষ্টকে অনেক নিন্দা করিয়াছিলেন। সদানন্দ বিষয়াদির সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া সকলের নিকট যথারীতি বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক ৺কাশীধাম যাত্রা করিলেন। সুকুমারী সেদিন আর শয্যা হইতে উঠিল না। সকলেই অনেক বুঝাইয়াছিল, কিন্তু সুকুমারী আহারাদি ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দিনরাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সদানন্দ কাশী যাত্রা করিলে পর সুকুমারী মাতার সহিত সদানন্দের বাটী ত্যাগ করিয়া আপনার পৈতৃক বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র অতিসত্বরে সুকুমারীর পৈতৃক বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত করিয়া দিলেন; এবং সদানন্দের বন্দোবস্তানুযায়ী মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া সুকুমারী ও সুকুমারীর মাতার ভরণপোষণনির্ব্বাহার্থে প্রদান করিতে লাগিলেন। সুকুমারী লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজার সময় প্রত্যহ সদানন্দের বাটীতে আসিত ও অতিথিগণের আহারের সময় উপস্থিত থাকিত। সুকুমারীর নিকট গ্রামের অনেকেই উপকৃত ছিল। সদানন্দের কঠিন ব্যবহারে যেমন সকলে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, সুকুমারীর সদয় আচরণে সকলে সেইরূপ সুকুমারীর বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সুকুমারীর অনুরোধে সদানন্দ অনেককেই ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, কত লোককে তাহাদের ভদ্রাসন বাটী ফেরৎ দিয়াছিল, কত লোককে সুদের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছিল, এ সমস্ত কারণে রায়পুরে সকলেই সুকুমারীকে বড়ই ভাল বাসিয়াছিল। এক্ষণে সুকুমারী পুনরায় নিজ পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া অনেকেই সুকুমারীকে দেখিতে আসিতে লাগিল; যেন সুকুমারীকে তাহারা কখন দেখে নাই—কত মিষ্টবাক্যে সুকুমারীকে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। সুকুমারী তাহাতে কতই লজ্জা পাইল। সকলেই সুকুমারীর কলঙ্কের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

সকলেই সুকুমারীর আচার ব্যবহারে তাহার কলঙ্কের কথা অবিশ্বাস করিয়াছিল, সময়ে সকলেই সুকুমারীর স্বামিপরীক্ষার কথা শুনিয়াছিল এবং শশিশেখরকে যে অপমানিত হইয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, তাহাও সকলে জানিয়াছিল। সকলে তাহা বিশ্বাসও করিয়াছিল। সুকুমারী শাপভ্রষ্টা হইয়া যে মনুষ্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাই সকলের ধারণা হইয়াছিল। বস্তুতঃ সুকুমারীর ব্যবহারে সুকুমারীকে মানুষী বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না। নিরন্তর পরোপকারব্রতে ব্রতী থাকায় সকলেই সুকুমারীর গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। এই রূপে কতদিন কাটিয়া গেল; সুকুমারী সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বের ন্যায় তুলসী-চরণে মালা গাঁথিয়া দেয়, ও সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে। সুকুমারীর মন কিন্তু সততই অসুখী—সদানন্দের বাটীতে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সুকুমারী একরূপে সময় অতিবাহিত করিত; কিন্তু বাটীতে আসায় সুকুমারী দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল—তাহার সেই কমনীয় রূপ দিন দিন ম্লানভাব ধারণ করিতে লাগিল। যেন কি বিষম অন্তর্দাহে সুকুমারীর হৃদয় পুড়িতেছিল। সুকুমারীর মাতা বুঝিয়াছিলেন যে, হৃষীকেশের অদর্শনই সুকুমারীর একমাত্র অসুখের কারণ। কিন্তু হৃষীকেশ কোথায়? সুকুমারী সধবা হইলেও স্বামিসুখে বঞ্চিত—এতদূর সদ্‌গুণ সত্বেও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে একদিনের জন্যও সুখী নহে। সুকুমারীর মাতা এই সব ভাবেন ও অশ্রুজল ফেলেন। সুকুমারী বাহিরে কোন চপলতা প্রকাশ করে না—কিন্তু সুকুমারী তুলসী-চরণে স্বামীর আগমনের জন্য শত শত বার প্রার্থনা করে। স্বামীর চরণদর্শনরূপ সৌভাগ্য নারায়ণের নিকট লক্ষ লক্ষ বার

কামনা করে। সুকুমারী রূপ, যৌবন, সকলই তুচ্ছ বোধ করিয়া সাংসারিক সকল সুখে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনীর ন্যায় দিন যাপন করে। গৃহে থাকিয়া সুকুমারী সন্ন্যাসিনী, কেবল এক জনের অভাবে—তাহাকে পাইলেই সুকুমারীর সুখের আর ইয়ত্তা থাকে না—স্বামিবিরহে সতীর কি সুখ সম্ভবে? এক জনের অভাবে সতীর সংসার শূন্যময় ও অরণ্য সমান—কিন্তু সেই একজন কোথায়? হায়! মনুষ্যের সুখ যখন পরের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করে, তখন সংসারে সুখের প্রত্যাশী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সুকুমারীর সকল সুখ হৃষীকেশের দয়ার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। হৃষীকেশ মনে করিলে সুকুমারীকে কতকাল পূর্ব্বেই সুখের সাগরে ভাসাইতে পারিত—কিন্তু পর্ব্বত টলিতে পারে মনুষ্যের মন টলে না—এক হৃষীকেশের উদাসীনতায় সুকুমারী দিবানিশি অসুখী—সুকুমারীর সুখের আশা আকাশ কুসুমের ন্যায় দূরধিগম্য—কতদিন গেল হৃষীকেশের উদ্দেশ কিছুই পাওয়া গেল না। যত দিন যাইতে লাগিল সুকুমারী ততই কৃশ ও মলিন হইতে লাগিল—সুকুমারীর যেন কি এক রোগের সঞ্চার হইয়াছে—দীর্ঘ নিশ্বাস অশ্রুজল সুকুমারীর সঙ্গের সাথী হইল—বড়ই ক্লেশে সময় কাটিতে লাগিল—স্বামীর অদর্শনে সতীর প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল—কেশবচন্দ্র সুকুমারীর মাতার অনুরোধে কত স্থানে কত লোক পাঠাইলেন। তাহারা একে একে ফিরিয়া আসিল—কিন্তু হৃষীকেশের কোন সংবাদ আসিল না।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন আসিল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসিল, মাসের পর মাস আসিতে লাগিল, কিন্তু হৃষীকেশের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আশ্বিন মাস শুক্লাষষ্ঠী—কল্য শারদীয়া পূজা, বঙ্গে আজ ঘরে ঘরে আনন্দোৎসব। সকলের মনই আনন্দে ভাসিতেছে—কিন্তু সুকুমারী শিশিরসিক্ত কমলিনীর ন্যায় ম্লানমুখী। প্রাণে সুখ নাই—সংসারে সুখের বস্তু নাই—প্রাণ নিরানন্দময়—সুকুমারীর প্রাণ বিজয়ার বিষাদে পরিপূর্ণ—প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় সুকুমারী তুলসী-চরণে মালা দেয় ও স্বামীর আগমন কামনা করে। লক্ষ্মীজনার্দ্দনের আরতির পর লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া স্বামীর আগমন ভিক্ষা চাহে। এইরূপে দিন কাটিয়া যায়, তথাপি স্বামী আসিলেন না। অদ্য ষষ্ঠী, অপরাহ্ণ সময় গ্রামে পূজার বাদ্যের রোল উঠিয়াছে—চতুর্দ্দিকে হুলাহুলি পড়িয়া গিয়াছে—নববস্ত্রে সকলে সজ্জিত—নব আনন্দে সকলের বদন আনন্দময়। কল্য পূজা হইবে—সকলেই যেন সংসারের দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে—যাহার পক্ষে সংসার শ্মশানবৎ ছিল, অদ্য আনন্দময়ীর আগমনে তাহার চক্ষেও সংসার নন্দনকানন সমান আনন্দপ্রদ। কিন্তু সুকুমারীর হৃদয়ের পরিবর্ত্তন নাই। সে মালা গাঁথিয়া তুলসী-চরণে দিতেছে ও বর মাগিতেছে—তাহার নয়নপ্রান্তে অশ্রুজল দেখা দিয়াছে। মালা দেওয়া শেষ হইলে সুকুমারী বলিতে লাগিল, "নারায়ণ, দাসী তোমার চরণে এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে

চিরদিন স্বামিসুখে বঞ্চিতা থাকিতে হইবে। ঠাকুর, আর ত যাতনা সয় না। অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হও। স্বামীবিহনে নারীর জীবনে কি ফল প্রভু? ঠাকুর, হতভাগিনী কাতরে প্রার্থনা করিতেছে, সদয় হইয়া তাহার স্বামীকে আনিয়া দেও। দীনবন্ধু, কতদিন আর যাতনা সহিব? দাসীর কামনা পূর্ণ কর প্রভু—নতুবা তাহার মৃত্যুবিধান করিয়া তাহার সকল যন্ত্রণার শেষ কর। সতী পতি ছাড়িয়া কি সুখে বাঁচিয়া থাকিবে? তুমি অন্তর্যামী—দাসীর মনোবেদনা তুমি সকলি বুঝিতে পারিতেছ। তবে কেন দাসীর উপর এত নির্দ্দয়, দয়াময়!" এই বলিয়া চক্ষুঃজল মুছিয়া তুলসী-চরণে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া সুকুমারী তুলসীকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য যেমন উঠিয়া দাঁড়াইল দেখিল তাহার পার্শ্বদেশে একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘায়তন যুবা পুরুষ। চারি চক্ষুঃ এক হইল, সুকুমারী আর দাঁড়াইতে পারিল না সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

হৃষীকেশ শর্ম্মা সুকুমারীর হাত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল পারিল না—দেখিল সুকুমারী মূর্চ্ছিতা। অনেক শুশ্রূষার পর সুকুমারীর চৈতন্য হইল। তখন হৃষীকেশ শর্ম্মা সুকুমারীকে ধরিয়া আস্তে আস্তে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। এবং একটী শয্যায় শয়ন করাইয়া পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সুকুমারী কতক পরিমাণে সুস্থা হইলে হৃষীকেশ শর্ম্মা সুকুমারীকে বলিল, "আমি তোমার উপর অতিশয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, রাই-পুরের কৃষ্ণলাল রায়ের জামাতা তোমার অঙ্গ স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই; সেই কথা শুনিয়া আমি সদানন্দের বাটীতে আসিতে

ছিলাম। রাস্তার এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছিলাম, এমন সময় একজন পথিক আমার নিকট বসিল। কথায় কথায় আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমি সদানন্দের বাটীতে স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে যাইতেছি। সেই কথা শুনিয়া সে তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিল।আমি নাম বলিলে সে তোমাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া গালি দিল। আমি সেই কথা শুনিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সেই লোকটাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম। কতকক্ষণ পরে তাহাকে মৃত মনে করিয়া আমি তাহাকে সেই স্থানে ফেলিয়া পলায়ন করিলাম।" সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "সেই পথিক কে ?" হৃষীকেশ বলিল, "আমি পরে জানিয়াছি, তাহার নাম সুরেশ।" সুরেশের নাম শুনিয়া সুকুমারী চমকিয়া উঠিল। হৃষীকেশ বলিতে লাগিল, "আমি পলায়ন করিয়া ক্রমশঃ কাশীতে পৌঁছিলাম। সেই স্থানে থাকিতে থাকিতে একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে লোকের ভিড় হইয়াছে দেখিয়া আমিও সেই খানে গেলাম। গিয়া দেখি একটী রোগী মৃত্যুশয্যায় শুইয়া রহিয়াছে—তখনও জ্ঞান আছে। দুটী একটী কথা কহিতেছে। রোগীকে দেখিয়া চিনিলাম যে, সে সদানন্দ; তখন আমি সকলকে সরাইয়া দিয়া সদানন্দের পার্শ্বে বসিলাম; সদানন্দ আমাকে চিনিতে পারিল। আমার পদস্পর্শ করিল। তোমাকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। তখন আমি সদানন্দকে বলিলাম, "সদানন্দ, তুমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এখনি তোমাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে—তোমার জীবনের আর আশা নাই। আর এই কাশীস্থান, মণি-কর্ণিকার ঘাট, গঙ্গাতীর—তুমি সত্য করিয়া বল,সুকুমারী কি

কুলটা?" তখন তাহার সেই কলুষিত চক্ষুদ্বয় ক্রোধে যেন বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—বলিল, পাপিষ্ঠ, দেবতার মধ্যেও ওরূপ পবিত্র স্বভাব বিরল, সুকুমারী আমার গর্ভধারিণী জননী।" সে আর অধিক বলিতে পারিল না; কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু বলিতে পারিল না। তাহার নয়নদ্বয় স্থির হইল, শ্বাস বন্ধ হইল। দেখিলাম, তাহার নাড়ী নাই, সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ হইয়াছে। সেই পবিত্র তীর্থে মণিকর্ণিকার তীরে সদানন্দ জীবলীলা সম্বরণ করিল। আমি তখনি সকল বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য ফিরিলাম। নিকটস্থ একটী চটীতে গত রাত্রিতে আশ্রয় লইয়াছিলাম; সেই খানে শুনিলাম যে, সেই চটী একবার পুড়িয়া গিয়াছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে একটী পথিক পথিপার্শ্বে মৃতবৎ পড়িয়াছিল, তাহার ভগিনী-পতি ও ভগিনী তাহাকে সেই স্থান হইতে তুলিয়া সেই চটীতে আনয়ন করে; পরে সে সুস্থ হইলে সেই চটীতে অগ্নি প্রদান করিয়া পলায়ন করে। তাহাতে তাহার ভগিনী ও ভাগিনেয়ের মৃত্যু হয়। পরে আরো অনুসন্ধানে জানিলাম যে, লোকটীর নাম সুরেশ, সদানন্দের ভাগিনেয়। সে নাকি পরে ডুবিয়া মরিয়াছে। সুরেশের চেহারা জিজ্ঞাসা করিয়া যেরূপ জানিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইল যে, আমি সুরেশেরই গলা টিপিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম। সুরেশের আমার হস্তে মৃত্যু হয় নাই, শুনিয়া আমার পুলিশের ভয় দূর হইল এবং আমি আর বৃথা বিলম্ব না করিয়া তোমার অনুসন্ধানে প্রথমতঃ সদানন্দের বাটীতে যাইলাম। সেখানে শুনিলাম যে, তুমি সে বাটী ত্যাগ করিয়াছ; এখানে আসিলাম। আসিয়া দেখি যে, তুমি তুলসী

গাছের নিকট কি করিতেছ, জানিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলাম; তুমি একমনে কি বলিতেছিলে, আমায় দেখিতে পাও নাই। যাহা হউক, সুকুমারী, তুমি পূর্ব্বের কথা সব ভুলিবে কি না? আমি তোমার মনে বিশেষ ব্যথা দিয়াছি—তোমার সহিত আমার যে আর দেখা হইবে, এমন মনে ছিল না। দৈববিড়ম্বনায় তোমার মনে আমি যথেষ্ট ক্লেশ দিয়াছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, তোমার নিকট হইতে আর আমি একপদ অন্য স্থানে যাইব না।" সুকুমারী বহুদিন পরে স্বামী সন্দর্শনে যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিল, সদানন্দের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া সেইরূপ দুঃখিত হইল। সে বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। হৃষীকেশ ও সুকুমারীর মাতা সুকুমারীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সুকুমারীর মাতা অবসর পাইয়াই প্রথমে হৃষীকেশকে, সুকুমারী সদানন্দের বিষয় না লইয়া হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিয়াছে, এ কথা বলিতে ভুলেন নাই—হৃষীকেশ এ কথা শুনিয়া সুকুমারীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলেন না। পরে সুকুমারীর ও হৃষীকেশের মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত শুনিয়া হৃষীকেশ অনেক পরিমাণে সন্তোষ লাভ করিলেন। ফলতঃ সেই রাত্রি বড় আনন্দেই কাটিয়া গেল। বিরহবিধুরা সুকুমারীর হৃদয় স্বামিসমাগমে বর্ষাকালীন নবজলসঙ্গমে স্রোতস্বিনীপ্রবাহের ন্যায় সুখে উথলিয়া উঠিল। সেই রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কাটিয়া গেল—দুইজনে কত কথা কহিলেন—কত কথা কহিতে ভুলিলেন—কত কথা কহিতে কহিতে অন্য কথা পাড়িলেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? সুখের রাত্রি বড় ছোট, দুঃখের রাত্রি হইলে হয়ত সূর্য্যদেব উদয়াচলে আসিতেই ভুলিয়া যাইতেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে কেশবচন্দ্র সদানন্দের মৃত্যুসংবাদ পাইলেন এবং মহাসমারোহে সদানন্দের শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। যে শুনিল, সেই সদানন্দের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেশবচন্দ্র হৃষীকেশকে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজার ও অতিথিশালার কার্য্য নির্ব্বাহের ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সুকুমারী অনেক দুঃখ ও যাতনার পর হৃষীকেশকে পাইয়া সুখী হইল। সুকুমারীর মাতা সুকুমারীর প্রথম পুত্রের নাম তুলসীদাস রাখিলেন। ক্রমশঃ সুকুমারীর আরো দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল। সদানন্দের প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারা সুকুমারী ও হৃষীকেশের স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। সুকুমারী স্বামী পুত্র ও কন্যা লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, সংসারে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পতন, এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিল।

সমাপ্ত